বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্ম ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্ব-ভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. কীর্তন : শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশ গুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ ।

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান

আধুনিক চীন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

এই গ্রন্থে চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, চীন-জাপান যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে।

অনুবাদক : শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৫৩

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

প্রথম অধ্যায়

চীনের পুরানো ইতিহাস

চীনদেশের নামকরণ, নামের অর্থ

প্রাচীনকালে চীনদেশের অনেকবিধ নাম প্রচলিত ছিল; কিন্তু অধুনা প্রচলিত এই নামটি চীনের দেশবাসীদের অনুমোদিত তো নয়ই, এমন কি সে নামের ব্যবহার যুক্তিযুক্তও নয়। চীনারা নিজেদের দেশকে চুং-হোয়া অথবা চুং-কুয়ো বলে। চুং মানে মধ্যস্থিত, হোয়া মানে ফুল কিংবা গৌরবময় অস্তিত্ব এবং কুয়ো মানে দেশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চীনারা মনে করে তাদের দেশ পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত, প্রচুর পুষ্প-শোভিত এবং রীতিমতো সমৃদ্ধ। এই সূত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে চীনের সভ্যতা সময়ের দিক থেকে প্রাচীনতম এবং গুণের দিক দিয়ে অতুলনীয়, এর অধিবাসীগণ প্রাচীন কাল থেকেই [illegible] অসভ্য জাতিগুলিকে বশীভূত করে এসেছে। কাজে কাজেই স্বদেশের নামকরণের ভিতর যদি একটু গর্বের ভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে তো এমন কিছু অসংগত হয়নি।

চিন্ ও হান্ বংশের রাজত্বকালে চীনে জায়গির-প্রণালীর প্রচলন হয়, ফলে জাতি হিসেবে চীন একতাবদ্ধ হল। দেশের ভিতরের ও বাইরের বিভিন্ন রাজকুল নিয়ে সামন্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল, এবং লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে রাজ্যও বাড়তে লাগল। ক্রমে দেশের সীমা বর্ধিত হতে লাগল আর গোষ্ঠীগত পার্থক্য কমে যেতে লাগল; ফলে চুং-হোয়া বা চুং-কুয়ো নামের ব্যবহারও কমে গেল। ঐতিহাসিক ও রাজতান্ত্রিক সমস্ত ঘটনাই চিন্, হান, থাং, চিং প্রভৃতি রাজবংশের নামে প্রসিদ্ধি পেতে লাগল।

'চীন' নামটির উৎপত্তি 'চিন' থেকে। চৌ বংশের রাজত্বকালে (খ্রীস্ট পূর্ব ১১২২-২৪৯) চিন একটি করদ রাজ্য ছিল; চীনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই রাজ্যটি ছিল বর্তমান কান্-সু এবং শেন-সি জেলা নিয়ে। প্রথমে এই রাজ্যটিও অন্যান্য করদ রাজ্যের মতোই দুর্বল ছিল এবং চিন্-কুয়ো নামে পরিচিত ছিল কিন্তু ক্রমে এই রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠে আশেপাশের রাজ্যগুলিকে জয় করে সমগ্র দেশকে একতাবদ্ধ করল। এই রাজ্যের রাজবংশের নামও দেশের নাম অনুযায়ী হল 'চিন্'। এই সময়ে মধ্য এসিয়ায় কতকগুলো অতি সাধারণ দেশ ছিল যাদের সাথে কেবলমাত্র চিন্-রাজ্যের যোগাযোগ ছিল; এরা এই চিন রাজ্যকেই সমগ্র চীনদেশ বলে জানত বা ভাবত। চিন্‌বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিন্ নামটা আরো বেশি জানাজানি হয়ে ক্রমে ভারতবর্ষ, গ্রীস ও রোম-এ ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে পৃথিবীময় এই দেশের 'চীন' নামটাই প্রচারিত হয়ে গেছে। মহাভারতে আমরা 'চিন্' নামের ব্যবহার দেখতে পাই; সেই থেকে প্রাচীনকালে ভারতের সঙ্গে চীনের যোগাযোগের কথা জানা যায়। একাধিক পাশ্চাত্ত্য মনীষী চীনের নামকরণ নিয়ে গবেষণা করেছেন, কিন্তু চীনের অতীতকালের ইতিহাস ভালোভাবে জানা না থাকায় তাঁরা কোনো সন্তোষজনক সমাধানে এসে পৌছতে পারেননি।

জাপানীরা চীনকে এখনও থাং এর নামেই অভিহিত করে, কারণ থাং রাজত্বকালীন (৬১৮-৯০৭ খ্রীস্টাব্দ) সভ্যতা জাপানীদের উপর খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সময়ে বহু জাপানী ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য চীনে আসেন, তাঁদের ভিতর কুক্কাই অথবা কোবোদাসির নামই বেশি উল্লেখযোগ্য; ইনি চীনের অক্ষরকে সামান্য রূপান্তরিত করে 'কনা' নামে একপ্রকার জাপানী হরফ উদ্ভাবন করেন।

এই মনীষী পঁচিশ বছর চীনে ছিলেন এবং জাপানের সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর নামই সর্বপ্রথম। জাপান যে শুধু সভ্যতার জন্যই চীনের কাছে ঋণী তা নয়, তার ধর্মও চীন থেকেই আমদানি; এই বৌদ্ধ ধর্ম উক্ত সময়ের কিছুকাল আগে ভারতবর্ষ থেকে চীনে প্রসারিত হয়েছিল।

১৯১১ সালের বিপ্লবে মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদ হয়, এবং একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে এখানেই বংশগত রাজাশাসন প্রণালীর শেষ। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই চীনদেশের নাম হয়েছে চুং-হোয়া গণতন্ত্র (রিপাব্লিক)। এখন থেকে চীনের ঐ নামেই পরিচিত হওয়া উচিত।

দেশ, দেশের জমি, জমির বিভাগ

আয়তনের দিক থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সব চেয়ে বড়ো, সোভিয়েট রাশিয়া দ্বিতীয়, এবং চীন তৃতীয়। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অধিকাংশ রাজ্যই অর্ধস্বাধীন অথবা উপনিবেশ, এবং গ্রেট ব্রিটেন আলাদা দেশ হিসেবে চীনের যে-কোনো ক্ষুদ্রতম প্রদেশ থেকেও ছোটো। রুশ সাম্রাজ্য বিশাল এবং একজাতিক; কিন্তু আর্কটিক্ সাগরের প্রান্তবর্তী এর অনেকটা অংশই প্রায় বারোমাস বরফে ঢাকা থাকে বলে বাসের অযোগ্য। কেবলমাত্র সমগ্র চীনদেশেরই আবহাওয়ার অবস্থা পরিমিত এবং ভূমি উর্বর। চীনকে দেশ না বলে মহাদেশ বললে অত্যুক্তি হয় না।

চীন এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম পারে অবস্থিত; এর পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্র, অন্য সব দিক স্থলবদ্ধ। চীনের রাজনৈতিক প্রাধান্যের দিনে কোরিয়া, লিউচিউ, ফরমোসা, আনাম, শ্যাম, বর্মা, ভুটান ও নেপাল হয় এর অধীনস্থ প্রদেশ নয় তো

করদ রাজ্য ছিল। শক্তিশালী জাপানও একদা চীনেরই অধীন ছিল এবং একজন জাপানী রাজা চীনসম্রাটের কাছ থেকে খেতাবও পেয়েছিলেন। মাঞ্চু রাজত্বের শেষভাগে চীনসরকার দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এই সুযোগে পাশ্চাত্য রাজারা চীনের অনেক অংশ নিজেদের অধিকার ভুক্ত করে নেন। ফলে সবগুলি সামন্ত রাজ্যই চীনের হাতছাড়া হয়ে যায়। চীনের পরিধি সম্প্রতি চল্লিশ লক্ষ বর্গ মাইলেরও বেশি; অর্থাৎ এশিয়ার এক চতুর্থাংশ, সমগ্র পৃথিবীর এক পঞ্চদশাংশ— এবং ইউরোপ থেকেও বড়ো।

ভৌগোলিক হিসাব অনুযায়ী চীনকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমেই আসল চীন, ১৯, ৯৪, ৬৪৪ বর্গ মাইল এবং আঠারোটি প্রদেশ সম্পন্ন। দ্বিতীয়ত মাঞ্চুরিয়া, অথবা তিনটি পূর্ব-প্রদেশ, ৪, ২৮, ৯৯৮ বর্গমাইল। তৃতীয়, মঙ্গোলিয়া, ৯,০৭, ২৩৪ বর্গমাইল। চতুর্থভাগে সিন্‌কিয়াং অথবা চীনা-তুর্কীস্তান, ৬, ৩৩, ৮০২ বর্গমাইল। সর্বশেষে তিব্বত, ৩, ৪৯, ৪১৯ বর্গমাইল। ১৯২৭ সালে নান্‌কিং-এ জাতীয় গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে চীনের সীমান্তনীতি এবং রাজ্যবিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত এবং সংশোধিত করবার সংকল্প করা হয়েছে। দশবছরের ভিতর এবিষয়ে বহু সংস্কার করা হয়েছে— যার ফলে এখন চীনদেশ আটাশটি প্রদেশে এবং দুটি স্বায়ত্তশাসিত দেশে (তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া) বিভক্ত। সমগ্র দেশের পরিধি এখন ৪৩, ১৪, ০৯৭ বর্গমাইল।

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার এবং যাতায়াত ও যোগাযোগের সুব্যবস্থার সাথে সাথে দেশ উন্নততর হয়ে উঠেছে আর লোকসংখ্যাও বেড়ে গেছে। বহু শিল্পকেন্দ্রে পরিচালনার বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং জাতীয় গভর্ণমেন্ট এই সব শহরে কিছু কিছু বিশেষ ক্ষমতার প্রবর্তন করেছে; এরা প্রায় স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশেরই মতো।

নূতন ধরনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় চীনে তিন রকমের বিভাগ আছে। এগুলি হচ্ছে (১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দর, (২) বিদেশীর বিশেষ অধিকার এবং (৩) ইজারাদার প্রদেশ। তথাকথিত এই আন্তর্জাতিক বন্দরগুলি সমুদ্রতীরের অথবা অভ্যন্তরীণ প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র, বিদেশের সঙ্গে এদের মুক্তসর্তে কারবার চলে। বাণিজ্যে স্বাধীনতা দেশ এবং দেশবাসী উভয়ের পক্ষেই ভালো; কিন্তু চীনের বাসিন্দারা এই বন্দরগুলিকে পছন্দ করে না। মাঞ্চু রাজত্বের শেষ ভাগে দুর্বল চীনের কাছ থেকে জোর করে অন্যায় রকমের সর্তদ্বারা এই সব জায়গাগুলি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই সব ঘটনাকে সন্ধি বলা উচিত নয়, কারণ সন্ধি বলতে দুই সমশক্তিসম্পন্ন দলের ইচ্ছানুযায়ী কতকগুলি চুক্তিকে বোঝায়। চীনের একশত বাণিজ্যকেন্দ্রের ভিতর অন্তত ৭০ টিই অনুরূপ সন্ধি থেকে উদ্ভূত। আর বিদেশীর বিশেষ অধিকার যেসব স্থানে বর্তমান, সেগুলিকেও এইরকম সন্ধিরই ফল বলা যায়; কারণ এতে বৈদেশিক শক্তিগুলি শাসন এবং বিচারের ব্যাপারে এমন কতকগুলো সুবিধা পেয়েছে যার উপর জাতীয় গভর্ণমেণ্টের কোনো হাতই নেই। কোনো কোনো বাণিজ্যকেন্দ্রে বিদেশীরা কমপক্ষে কুড়ি রকমের সুবিধাও পায়। ইজারাদার প্রদেশগুলি চীনেরই এলাকাভুক্ত, এগুলো জোর করে চীনের থেকে ইজারা নেওয়া হয়; নামেই ইজারাদার, প্রকৃতপক্ষে বিদেশীর অধিকৃত। ইজারার মেয়াদও দীর্ঘ,—বেশীর ভাগই ৯৯ বছরের জন্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও দেশগুলো আর ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি; যেমন জাপান অধিকৃত পোর্ট-আর্থার এবং দারিয়েন বে। এই সব স্থানে সামাজিক দুর্নীতিও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান এবং এগুলো বদমায়েশির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। এই ধরনের আন্তর্জাতিক বন্দর বা রাজ্যগুলি যে কেবলমাত্র চীনের একতা

ও স্বাধীনতাকেই ব্যাহত করছে তা নয়, এরা অন্তঃসারশূন্য বহুকথিত আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং ন্যায়বিচারের একেবারে চরমতম নিদর্শন। জাতীয় গভর্ণমেণ্ট এদের উচ্ছেদের জন্য বিশেষ চেষ্টা করছে, এবং প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছে। অনেকগুলি অসমান সন্ধিরই উচ্ছেদ হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ ইজারাদার প্রদেশ এখনও ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।

জাতি, শ্রেণী ও সংখ্যানির্ণয়

চীনের অধিবাসীদের প্রধানত ছয়টি "ৎসু" অর্থাৎ জাতি বা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; (১) হান্-ৎসু অথবা হান, (২) মিয়াও-ৎসু অথবা মিয়াও, (৩) মান্-ৎসু অথবা মাঞ্চু, (৪) মং-ৎসু অথবা মঙ্গোল, (৫) হুই-ৎসু অর্থাৎ মুসলমান শ্রেণী এবং (৬) ৎসাং-ৎসু অথবা তীব্বতীয়। হান্-রা চীনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে আদিচীনেই এরা বসবাস করতে থাকে; এরাই জাতি হিসেবে দেশের প্রাচীনতম এবং প্রধান। চীনের ইতিহাস বা সভ্যতা বলতে এদেরই সভ্যতার ইতিহাস বোঝায়; এরাই চীনের প্রকৃত প্রতিনিধি। মিয়াও-রা আবার নিজেদের ভিতর বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত; এরাও চীনের বহু পুরাতন অধিবাসী, কিন্তু সংখ্যায় কম। প্রগতিতে তারা অনেক পিছনে পড়ে আছে। প্রথমে তারা সমগ্র দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু ক্রমশ দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের পার্বত্য অঞ্চলে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পড়ল। হান্দের সাথে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে মিশে গেছে এরকম একটি অংশ ছাড়া মিয়াও-রা আদিম জীবনই কাটাচ্ছে। মান্-ৎসু অথবা মাঞ্চুরা এদের তুলনায় নূতন শ্রেণীর; এরা আসলে মাঞ্চুরিয়ার বাসিন্দা হলেও হান্দের সাথে পুরোপুরি ভাবে মিশে গেছে। মঙ্গোলরা এদের নামেরই আলাদা রাজ্যে বাস করত; জাতি

বা বংশ হিসেবে এরাও নূতন এবং সংখ্যালঘু। এদেরও অধিকাংশই হান্‌দের অন্তর্ভূত হয়ে গেছে। মুসলমানেরা প্রায় সকলেই সিন্‌কিয়াং অথবা চিনে-তুর্কীস্তানের বাসিন্দা। আসলে এরা বিদেশ থেকে এসেছিল, কিন্তু এখন হান্‌দের সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে; এদের আদিম বর্বরজাতি বলে বিবেচনা করা হয়। ৎসাং-ৎসু অথবা তীব্বতীয়দের অবস্থাও প্রায় মঙ্গোলদের মতো; তারাও প্রায় সকলেই তিব্বতের বাসিন্দা এবং সংখ্যায়ও বেশি নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ছয় ভাগে বিভক্ত হলেও জাতি হিসেবে এদের ভিতর বেশি তফাত বা তারতম্য নেই; এরা সকলেই চৈনিক মহাজাতি সংগঠনে অল্পবিস্তর অংশ গ্রহণ করেছে।

চীনের সঠিক লোকসংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নয়; তার কারণ আদমসুমারির সুবন্দোবস্তের অভাব নয়,—দেশের বিশালতার জন্য। লোকগণনার ব্যাপারটা চীনে বহু পুরানো, ইতিহাস পড়ে জানা যায় যে খ্রীস্টপূর্ব নবম শতকে লোকসংখ্যা ছিল দু'কোটি কুড়ি লক্ষ। খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভে লোকসংখ্যা আট কোটি পর্যন্ত হয়েছিল। এর পরে সকলে করপ্রদান এবং যুদ্ধে যোগদানের ভয়ে পরিবারের সঠিক ব্যক্তি-সংখ্যা গোপন করতে আরম্ভ করল। ডাক এবং শুল্ক বিভাগ স্থাপনের পর থেকে এদের সহায়তায় দেশের সঠিক লোকসংখ্যা গণনা করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীবিভাগের ১৯২৮ সালের গণনায় দেখা যায় এই সংখ্যা ৪৭, ৪৭, ৮৭, ৩৮৬; কিন্তু ঐ বছরেই ডাক ও শুল্ক বিভাগের হিসাবে আবার কিঞ্চিৎ তারতম্য দেখা গেছে।

মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, হিন্দু এবং চৈনিক এই চারটি জাতির সভ্যতা সবচেয়ে প্রাচীন। এদের ভিতর প্রথম দুটির স্মৃতি শুধু ইতিহাসেই রক্ষিত; কিন্তু হিন্দুরা এবং চৈনিকরা এখনও সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আছে। এই প্রভেদের কারণ কী। এই দুটি জাতির

ভিতর নিশ্চয়ই এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যার জন্য এরা ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছে। চীনাদের চরিত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে (১) সহিষ্ণুতা, (২) পারিপার্শ্বিকের উপযোগীকরণের এবং (৩) সংগতি সংরক্ষণের শক্তি। এছাড়াও এদের আরো তিনটি বিশেষ গুণ আছে; (১) শান্তিপ্রিয়তা, (২) নম্রতা এবং (৩) সাধুতা বা কর্তব্যনিষ্ঠা। অন্যান্য জাতির মতো এদেরও কতকগুলি বিশেষ দোষ আছে, কিন্তু সেগুলো খুব মারাত্মক রকমের নয়।

পৃথিবীর সর্বত্রই এক দেশের সাথে অপর দেশের যোগাযোগ ক্রমশ বর্ধিততর হচ্ছে; চীনও বিদেশী সভ্যতার কিছু কিছু গ্রহণ করতে শুরু করেছে। আশা করা যাক বৈদেশিক সভ্যতার ভালোটুকু গ্রহণ করে এবং নিজের ত্রুটিগুলির সংশোধন করে ভবিষ্যতে সে মহত্তর হয়ে উঠবে।

আদিমতম সভ্যতা

ইয়োরোপের মনীষীগণ মিশর ও ব্যাবিলনের সভ্যতাকে সবচেয়ে পুরানো মনে করেন। চীন সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতাই এই ভুলের কারণ। প্রকৃতপক্ষে এই সব দেশ থেকে চীনের সভ্যতা অনেক বেশি পুরাতন। মিশরীয় এবং ব্যাবিলনীয় জাতি বহুকাল হল লুপ্ত হয়েছে এবং তাঁদের সভ্যতার যেকটি নিদর্শন আজও বর্তমান রয়েছে তারই উপর নির্ভর করে পণ্ডিতেরা একথা প্রচার করে থাকেন। কিন্তু চীনের পুরাকালের ইতিবৃত্ত প্রায় সমস্তই সংরক্ষিত আছে যা থেকে এর প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না।

এই সকল পুরানো ঐতিহাসিক নথিপত্র থেকে জানা যায় যে য়ৌ-ৎসাও সর্বপ্রথম বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে শিক্ষা দেন। সুয়েই-জেন

কাঠের থেকে আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করতে শেখান। এই সমস্ত আবিষ্কার দশ হাজার বছরেরও আগের ঘটনা। ফু-শি শিখিয়েছিলেন জালের সাহায্যে মাছ আর ফাঁদ পেতে শিকার ধরতে; যন্ত্রসহযোগে গান করতেও শেখান ইনিই। তিনিই বিবাহের আনুষ্ঠানিক আচরণ-পদ্ধতি চালু করে পৃথিবীতে সামাজিক বিবাহের গোড়াপত্তন করেছেন। আটপ্রকারের চিত্রাঙ্কন প্রথা আবিষ্কার করে তিনি লিখিত ভাষার অক্ষর সৃষ্টি করেন। সময় পরিমাপের উপায়ও তিনিই উদ্ভাবন করেন। শেন-নুং লাঙল এবং কোদাল আবিষ্কার করে চাষ করতে শেখান; বাজারের মতো একপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করে তিনি উৎপন্ন দ্রব্যাদির আদানপ্রদানের বন্দোবস্ত করেন। নানাবিধ গাছগাছড়া থেকে ঔষধ তৈরি করে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পঞ্জিকা-প্রণালীরও উন্নতি করেন। মনে রাখতে হবে যে এই সমস্তই ঘটেছে দশ হাজার বছর আগে। সেই থেকে বহু ঋষি একটার পর একটা জিনিস আবিষ্কার করে সমগ্র জগৎকে চীনের কাছে ঋণী করে রেখেছে। খ্রীস্টপূর্ব ২,৭০০ শতকে হোয়াং-তি অথবা পীত সম্রাটের রাজত্বকাল। তিনি খুব ভালো রাজা ছিলেন; কিন্তু সভ্যজগৎ কতকগুলো অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কারের জন্য তাঁকে স্মরণ করে। এই আবিষ্কারের কতকগুলোর নাম করা যেতে পারে, যেমন (১) পোশাক ও টুপি, (২) যান ও নৌকা, (৩) হামান দিস্তা, (৪) তীরধনুক, (৫) দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র, (৬) ধাতু মুদ্রা এবং (৭) শবাধার। নিজের আবিষ্কার বাদেও তিনি ব্যবহারিক বহু জিনিসেরই উন্নতি সাধন করে গেছেন; যেমন জ্যোতিষ শাস্ত্র, ঋতু নির্ণয় পদ্ধতি, সৌরবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা, ইত্যাদি।

সভ্যতা প্রসারের ইতিহাস দীর্ঘ, কিন্তু গতিপথ নির্ধারিত। মানুষ প্রথমে তার খাদ্য এবং বাসস্থানের অভাব দূর করে, পরে পরিচ্ছদ এবং

ব্যবহারের যন্ত্রাদি। জ্যোতিষ বিদ্যা, ঋতু ও সময় নির্ণয়ের বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা আসে তার পরেই; তারও পরে আবিষ্কার করা হয় অক্ষর ও সাহিত্য। ক্রমশ মানুষ তৈরি করল সামাজিক রীতিনীতি, এল সংগীতকলা, স্থাপিত হল শাসনপ্রণালী; তারপর এল কর্তব্যজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ধর্ম এবং দর্শন। পীত সম্রাটের রাজত্বকালে (খ্রীস্টপূর্ব-২৬৯৭ থেকে ২৫৯৮ শতক) উপরোক্ত সভ্যতা বিকাশের নিদর্শনস্বরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম উন্নতিসাধন হয়েছিল। ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও কর্তব্যবিজ্ঞানের চরমতম বিকাশ হয়েছিল শিয়া, শাং এবং চৌ বংশের রাজত্বকালে (খ্রীস্টপূর্ব ২০০০-১০০০)। চীনের সভ্যতার ইতিহাসে এবং পৃথিবীর প্রগতিশীলতার ইতিহাসে এটা স্বর্ণযুগ।

কোনো দেশের সভ্যতার তথ্য আহরণ করতে হলে সে দেশের লেখাভাষার অক্ষরের উপর খুব বেশি নির্ভর করতে হয়। চীনা হরফ আবিষ্কার করেন ফু-শি এবং সমাপ্ত করেন পীতসম্রাট। কিংবদন্তী যে পীতসম্রাটের ঐতিহাসিক-মন্ত্রী ছাং-চি রাজআজ্ঞায় এই হরফ তৈরি করেন। আসলে তাঁর আমলে এটা আবিষ্কৃত হয়নি; তিনি একে সুসম্বদ্ধ ও সংকলিত করেছিলেন। অজ্ঞতাবশত অনেক বিদ্বান ব্যক্তিই মনে করেন চীনাভাষা শেখা অত্যন্ত শক্ত। অনেকে আবার অন্যান্য দেশের বর্ণমালার সঙ্গে তুলনা করে চীনাভাষাকে চিত্র থেকে উদ্ভূত বলে থাকেন। চীনাভাষা শেখা যে খুব কঠিন ব্যাপার, এ ধারণাটা ভুল। আর এ-ভাষাকে সচিত্র বলাটাও পুরোপুরি ঠিক নয়। তিনটি বিষয় নিয়ে তবে একটি খাটি বর্ণমালা তৈরি হতে পারে; তারা হচ্ছে গড়ন, উচ্চারণ এবং অর্থ। এর যে-কোনোটার অভাব ভাষাকে পঙ্গু করে। বস্তুতপক্ষে পৃথিবীতে এমন কোনো অক্ষরমালাই নেই যা পুরোপুরি

চিত্রধর্মী অথবা পুরোপুরি বর্ণবিন্যাসে গঠিত। চীনা ভাষার সংরচন ও ব্যবহারকে ছয়ভাগে ভাগ করা যায়। যাকে বিদেশী পণ্ডিতেরা চিত্রধর্মী বলেন সেটা হচ্ছে এরি একটা ভাগ, বলা যায় 'আকৃতির অনুরূপ'। প্রাচীনকাল থেকেই অক্ষরের এই রূপের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আরেকটা জিনিস ভুললে চলবে না যে সমগ্র চীন দেশেরই লিখিত এবং কথিত ভাষা এক; এই একভাষিকতা সমগ্র চীনকে সংঘবদ্ধ ও একতাবদ্ধ করতে প্রচুর সহায়তা করেছে এবং করছে।

ঐতিহাসিক নথিপত্রগুলো অতীতের ইতিহাস জানবার পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়। অক্ষরমালা সৃষ্টির সময় থেকেই চীনের লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়। পীতসম্রাটের রাজত্বকালে দুজন ঐতিহাসিক মন্ত্রী ছিলেন, একজন রাজার বামপার্শ্বে বসে রাজা, মন্ত্রী অথবা আবেদনকারীদের বক্তৃতা বা কথা লিপিবদ্ধ করতেন, আর রাজার ডান দিকে যিনি থাকতেন তিনি প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করে যেতেন। দুর্ভাগ্যবশত এইগুলির প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে, বিশেষ করে চিন-সি-হোয়াং-তি-এর আমলে, বই পুড়িয়ে যিনি প্রভূত আনন্দলাভ করতেন। অনেক পুঁথির কেবলমাত্র নামই আমরা জানি, কিন্তু বইটা লুপ্ত হয়েছে। অবশ্য অনেক বই আজও আছে, যেমন য়ি-চিন অথবা বিবর্তনবাদ— যেটি ফু-শি-র সময়কার পুস্তক। 'সাং-সু' লেখা হয় খ্রীস্টপূর্ব ২৩৫৭ থেকে ২২০৮ শতকের ভিতর; থাং এবং য়ু-এর আমলে এটা লিখতে শুরু করা হয়। কনফুশিয়ুস সম্পাদিত 'শি-চিন' অথবা 'কাব্যগাথা' শাং এবং চৌ-এর আমলের (খ্রীস্ট পূর্ব ১৫০০-৫০০) সংগীত সংগ্রহ। হিন্দুদের বেদগ্রন্থ ছাড়া পৃথিবীতে এত পুরাতন পুস্তক আর কোথাও নেই। এ ছাড়াও খুব পুরাতন যুগের লোকসংগীত পাওয়া যায় আরো অন্যান্য গ্রন্থে। তাং-য়াও-এর আমলের অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ২৩০০-২২০০ শতকের

লোকসংগীতের একটা নমুনা দেওয়া যাক। এইসঙ্গে প্রায় সমসাময়িক য়ু-য়ুন-এর একটি গানেরও নমুনা দেওয়া হল।

১

সূর্যোদয়ের সাথে আমি উঠি,
সূর্যাস্তের আগে পাইনে বিশ্রাম।
জলের জন্য কুয়ো খুঁড়ি,—
খাদ্যের জন্য চষি জমি।
'তি' এর শক্তি আছে? থাক না,
আমি তা নিয়ে কী করব, বলো?

২

ওগো মেঘ, তব দীপ্ত প্রভা
ছড়াইয়া দাও, ছড়ায়ে যাও;
ওগো রবি শশী, দিবসগুলিরে
উজলিয়া দাও, মোহিয়া যাও।

আধুনিক এই যে বিজ্ঞানের যুগ, এরও আরম্ভ চীনে। 'শান-তাই' অথবা ত্রি-বংশের সময় থেকেই (খ্রী-পূ ২০০০-১০০০) লু-য়ি অথবা ষড়শিল্প এবং লু-কু অথবা ষড়কর্মপদ্ধতির চর্চা চীনে ছিল। এই ছয়রকম কর্মপদ্ধতি বা বিজ্ঞানের নাম হচ্ছে 'তু-কুং' অথবা স্থপতিবিদ্যা, 'চিন্-কুং' বা ধাতু বিদ্যা, 'শি-কুং' অথবা বাড়ি তৈরির কাজ, 'মু-কং' অথবা সূত্রধরের কাজ, 'সউ-কুং' অথবা প্রাণিবিজ্ঞান এবং 'চ্ছাও-কুং' অথবা উদ্ভিদবিজ্ঞান। ছয় প্রকার কলা বিদ্যার নাম হচ্ছে 'লি' অথবা শিষ্টাচার, 'য়ো' অথবা সংগীত, 'শে' অথবা ধনুবিদ্যা, 'য়ু' অথবা সারথ্য, 'শু' অথবা রচনা এবং 'সু' অথবা অঙ্কশাস্ত্র। এই সব শিল্পের আবার বহু শাখা আছে, যেমন শিষ্টাচার ধনুর্বিদ্যা এবং সারথ্যের পাঁচটি, সংগীত ও রচনার ছয়টি এবং অঙ্কশাস্ত্রের নয়টি। রাষ্ট্রিক বিচার এবং

শৃঙ্খলাবিধান, যুদ্ধনীতি ও সমরকৌশল সম্বন্ধে শিক্ষাদানেরও ব্যাপক বন্দোবস্ত ছিল। চীন চারিটি অতি প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দাবি রাখে ;— দিকনির্ণয় যন্ত্র, কাগজ, মুদ্রাযন্ত্র এবং বারুদ। চীনা সভ্যতার নিম্নলিখিত চারটি গুণ দেখা যায়।

(১) এ-সভ্যতা ছিল মৌলিক এবং সৃজনক্ষম। এ-সভ্যতা চীনের খাঁটি নিজস্ব, কারো কাছ থেকে ঋণ বা কারো অনুকরণ নয়।

(২) স্থায়িত্ব এর সব চেয়ে বড়ো গুণ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মিশর ও ব্যাবিলনের সভ্যতা কালের গহ্বরে অবলুপ্ত হয়েছে; কিন্তু চীনের সভ্যতা শুধু যে বেঁচেই আছে তা নয় এখনও প্রসার লাভ করছে।

(৩) এর ব্যাপকতা। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে এর বর্ণমালা ও ভাষা, যা সমগ্র চীনের পক্ষেই এক, আয়তনে যা সমগ্র ইয়োরোপের থেকেও বড়ো।

(৪) সর্বশেষ গুণ হচ্ছে এর মানবিকতা ও বিশ্বপ্রেমিকতা; সর্বজনীন মঙ্গল সাধন।

একথা জোর করেই বলা যেতে পারে যে একমাত্র ভারতীয় সভ্যতা বাদে প্রাচীন বা অধুনাতন কোনো সভ্যতাই এর থেকে উঁচুদরের বা এর সমকক্ষ নয়। মিশর ও ব্যাবিলনের সভ্যতা স্থায়ী হয়নি গ্রীক বা রোমীয় সভ্যতাও এত ব্যাপক নয়। ইয়োরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে এখনও কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণী করবার মতো সময় আসেনি, কিন্তু এমন কি কেউ আছেন যিনি এ সভ্যতার আকর্ষণে বিমোহিত ?

প্রাচীনতম ইতিহাস

পৃথিবীর সভ্য জাতিগুলির ভিতর একমাত্র চীনেরই প্রাচীনতম ইতিহাস লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায়; সুতরাং ইচ্ছে করলে এর থেকে চীনের পুরানো ইতিহাস জানতে পারা যায়।

কথিত আছে যে পান-কু চৈনিক ইতিহাসের স্রষ্টা। তিনিই নাকি পৃথিবী সৃষ্টি করে এর আধিপত্য করেছেন; তাঁর সাতটি হাত এবং আটটি পা ছিল। পান-কু—এর পরে সান-হোয়াং অথবা পৌরাণিক সম্রাটত্রয়ের নাম পাওয়া যায়, যথা;—থিয়েন হোয়াং অথবা স্বর্গরাজ তি-হোয়াং অথবা মর্তরাজ এবং জেন-হোয়াং অর্থাৎ মানুষের রাজা। সান-হোয়াং এর পর শি-চি অথবা দশটি ঘটনার বিখ্যাত যুগ; শি-চি এর পরে উ-তি অথবা পঞ্চ বিচারক। এই সব সময় সম্পর্কীয় বহু পুস্তক আছে; ঐ সকল ঘটনা সত্য হলেও বইয়ের লেখাগুলিকে অত্যুক্তিই বলতে হবে। কিন্তু পীতসম্রাটের সময় থেকেই আমরা প্রকৃত নির্ভরশীল ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ দেখতে পাই।

পীতসম্রাটের রাজত্বের পূর্বে চীনে বহুরাজকতা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন ভূঁইয়ারা পরস্পরের ভিতর আধিপত্য নিয়ে যুদ্ধ করত। কোনোরকম সামাজিক শৃঙ্খলা বা সুসভ্য অবস্থা ছিল না। খ্রীস্টপূর্ব ২৬৯৭ অব্দে পীতসম্রাট চীনকে একতাবদ্ধ করে একটি বিস্তীর্ণ রাজত্বে পরিণত করেন। সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সরকারী আইনকানুন দিয়ে সবদিকে দেশকে উন্নীত করে তোলা হয়। বস্তুত পীতসম্রাট চীনা জাতির জনক এবং লোক সমাজের স্রষ্টা। এইজন্যই চীনারা তাদের পীতসম্রাটের বংশধর বলে বিবেচনা করে, এবং তাঁর রাজত্বের প্রথম বছর থেকেই চীনের ঐতিহাসিক যুগের হিসাব শুরু।

পীতসম্রাট যদিও যুদ্ধ করেই সিংহাসন দখল করেন, তিনি এবং তাঁর বংশধরেরা শক্তি অপেক্ষা সংগুণের প্রভাবেই রাজত্ব পরিচালনা করেছেন। পীতসম্রাটের সর্বশেষ বংশধর তি-চীকে, তার অক্ষমতার জন্ত প্রজারা সিংহাসনচ্যুত করে এবং য়্যাওকে সম্রাট করে দেয়। পুরো একশ বছর রাজত্ব করবার পর য়্যাও স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে শুন্‌-কে রাজত্ব দান করেন। সম্রাট য়্যাও এবং শুন্‌ এর নিপুণতা এবং সাধুতা চন্দ্র সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। তাঁরা কেবলমাত্র তাঁদের ব্যক্তিত্বের জোরেই রাজ্য পরিচালনা করে গেছেন, এবং স্বেচ্ছায় অনুরূপ উপযুক্ত আরেকজনের হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে গেছেন। কনফুসিয়ুস এবং মেনসিয়ুস এই দুজনকে আদর্শ সম্রাট এবং এঁদের রাজ্যপরিচালন-প্রণালীকে আদর্শ বলে বিবেচনা করতেন। চীনের ইতিহাসের এই গৌরবময় যুগকে 'শান-ইয়াং' অথবা 'স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগের যুগ' বলা হয়।

'য়ু' ছিলেন সম্রাট য়্যাও এবং শুন্‌-এর মন্ত্রী। দেশের নয়টি বড়ো নদীর মুখ খুলে স্রোতকে সমুদ্রের দিকে পরিচালিত করে তিনি দেশকে বন্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সম্রাট শুন্‌-এর পর তাঁকেই উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা হল। আট বছর রাজত্বের পর বার্ধক্যের জন্ত তিনি রাজ্যত্যাগ করেন এবং প্রথা অনুযায়ী তাঁর মন্ত্রী পো-য়ি কে রাজত্ব দিয়ে যেতে চান, কিন্তু প্রজারা তাঁর ছেলে চি-কেই উত্তরাধিকারী নির্বাচন করল। সেই থেকে বংশানুক্রমিক রাজপ্রথাই আবার চলতি হল; বংশের নাম হল 'শিয়া'। এই বংশে বারো পুরুষ ধরে সতেরোজন সম্রাট ৪৩৯ বছর রাজত্ব করেন (খ্রীস্ট পূর্ব ২২০৫-১৭৬৬)। চেন-টাং-নামে একজন শক্তিশালী-অভিজাত ব্যক্তি এই বংশের শেষ রাজা অত্যাচারী চিয়ে-কে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই রাজা হন। এই

রাজবংশ 'শাং' নামে পরিচিত; এই বংশের ২৮ জন রাজা ১৬ পুরুষ ধরে ৬৪৪ বছর রাজত্ব করেন (খ্রীস্টপূর্ব ১৭৬৬—১১২২)। বংশের শেষ রাজা অত্যাচারী চৌ ও চিয়ের মতো অভিজাত বংশজ শক্তিশালী ফা-এর দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হন। অতঃপর চউবংশ নাম দিয়ে 'ফা' তাঁর রাজত্ব শুরু করেন। চীনের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় বিপ্লব। এই চউবংশের রাজত্বকাল ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ; ৩৭ জন সম্রাট ৩৩ পুরুষ ধরে ৪৬৭ বছর রাজত্ব করেন (খ্রীস্টপূর্ব ১১২২—২৫৫)।

চউ রাজত্ব চীনের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। এই বংশের সরকারী নিয়মকানুন এবং রাজত্ব পরিচালন প্রণালীর বিবরণী পুস্তক চউ-লি পড়ে তাঁদের দক্ষতা ইত্যাদিকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। এই সময়ে কৃষ্টি ও সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছিল এবং এই সময়ে বহু মুনি ঋষির আবির্ভাব হয়। এটুকু মনে রাখলেই হবে যে মহাপ্রাণ লাও-তু, কনফুসিয়ুস এবং মেনসিয়ুস, মো-তু, চুয়াং-তু, শুন্-তু এই সময়ের লোক। কমপক্ষে দশটি দর্শনবাদী সংঘ ছিল এ সময়; বিদ্যা এবং চিন্তাধারা ছিল স্বচ্ছন্দ,—চৈনিক সংস্কৃতির যথার্থ বিকাশ হয়েছিল।

এই সময়ের আরো দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে জায়গিরপ্রণালী এবং চিং-থিয়েন প্রথার গোড়াপত্তন।

জায়গির-দানপ্রণালী বা করদ রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়েছিল পীতসম্রাটের রাজত্বকালে, তারপর শিয়া এবং শাং রাজত্বের সময়ে এই প্রথা একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে চউ রাজত্বের সময় সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে। দেশকে নয়টি চৌ বা বিভাগে ভাগ করা হয়; প্রত্যেকটি চৌ আবার কতকগুলি পাং বা করদ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আয়তন অনুযায়ী করদ রাজ্যগুলি পাঁচ শ্রেণীর; প্রথম, 'কুং' অথবা ডিউক-এর অধীন, আয়তন ৫০০ বর্গ লি; দ্বিতীয়, হউ অথবা

মাকুইসের অধীন, আয়তন ৪০০ বর্গ লি ; তৃতীয়, 'পেং' অথবা আর্ল-এর অধীন, আয়তন ৩০০ বর্গ লি ; চতুর্থ, 'তু' অথবা ভাইকাউন্ট-এর অধীন: আয়তন ২০০ বর্গ লি ; পঞ্চম, নান অথবা বেরন-এর অধীন, আয়তন ১০০ বর্গ লি। একসঙ্গে বলা হত চু-হউ অথবা জায়গির যৌবরাজ্য। সরকারের নিজ তত্ত্বাবধানে যে জায়গাটুকু থাকত তাকে বলা হত হোয়াং-চি অথবা রাজার খাসরাজ্য। প্রতি বৎসর এই জায়গিরদারদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিস্তৃত বিবরণ পাঠাতে হত, এবং প্রতি তিন বছর বাদে রাজ্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। চৈনিক জায়গিরপ্রণালী মূলত গণতান্ত্রিকই ছিল; বৈদেশিক জায়গিরপ্রণালীর সঙ্গে তার এইখানেই প্রভেদ।

চিং-থিয়েন হচ্ছে রাজ্যের ভৌম প্রণালী। সমস্ত জমিই জাতিগত এবং সকলের ভিতর সমান ভাবে জমি ভাগ করে দেওয়া হত। প্রত্যেক 'লি'কে নয়ভাগে ভাগ করা হত, প্রত্যেক ভাগে থাকত ১০০ মউ ; এই ৯০০ মউ এর ৮০০ ভাগ আটটি পরিবারকে বণ্টন করে দিয়ে বাকি ১০০ মউ থাকত ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসেবে, এটা ছিল সার্বজননীন এবং সকলে মিলে পালা করে এ জমিটুকু চাষ করত। এই সার্বজনীন জমির উৎপন্ন দ্রব্য খাজনা হিসেবে সরকারকে দেওয়া হত ; জনসাধারণকে এই সার্বজনীন জমির প্রতি নিজেদের জমির চেয়েও বেশি মনোযোগ দিতে হত।

জায়গিরপ্রথা বহুদিন পর্যন্ত বেশ ভালোভাবেই কাজ করছিল কিন্তু বিভিন্ন যশোলিপ্সু ভূঁইয়ারা ক্রমে নিজেদের ভিতর মারামারি শুরু করে দিল। চউ রাজত্বের শেষভাগে দেশে সাতটি করদ রাজ্য ছিল। তার মধ্যে 'চিন' ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। চিন-এর রাজা 'চেন' অন্য করদ রাজ্যগুলি অধিকার করে চউ বংশের সর্বশেষ সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত

করে চিন বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি জায়গিরপ্রথা তুলে দিয়ে চীনের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা করলেন। সমগ্র জাতিকে একতাবদ্ধ করে তিনি দক্ষিণে আসাম এবং পূর্বে জাপান অধিকার করেন। তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে ৪০টি চুন অথবা বিভাগে বিভক্ত করেন এবং আলেকজাণ্ডারের মতো মনে করেন যে তিনি সমগ্র পৃথিবী জয় করেছেন। তিনি আশা করেছিলেন যে চিন-বংশ চিরস্থায়ী হবে, কিন্তু এইটিই চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে স্বল্পায়ু রাজবংশ কারণ তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সম্রাট এশ-শী-কে অত্যাচারের জন্য সিংহাসনচ্যুত করা হয়। তিনি সামরিক ব্যাপারে বড়ো বেশি জড়িত থাকতেন এবং সংস্কৃতির দিকটা একেবারে উপেক্ষা করতেন। তাঁর আদেশে গ্রন্থ বহু পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং গুণীলোকদের জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়; সুতরাং শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বিদ্রোহকারীদের নেতা ছিলেন লিউ-পাং নামে একজন সাধারণ লোক; পরে লিউ-পাং রাজা হয়ে হান-কাও-ৎসু নাম গ্রহণ করে হান বংশের সৃষ্টি করেন। চীনের ইতিহাসে এটি সর্বপ্রথম জনবিদ্রোহ।

হান-বংশ ৪০৩ বছর রাজত্ব করে ২২০ খ্রীস্টাব্দে শেষ হয়। এই বছর থেকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র স্থাপিত হওয়া পর্যন্ত অনেক রাজবংশ রাজত্ব করেছে; তার ভিতর শিল্প এবং চীনামাটির দ্রব্য ইত্যাদির জন্য থাং এবং সুং বংশের নাম জগৎখ্যাত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিক চীনের রাষ্ট্রিক পরিবর্তন

মাঞ্চু শাসনের শেষ এবং চিং বংশ

যুগ নির্দেশে ইতিহাসকে ভাগ করা শক্ত, কারণ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির মূলে যে কারণ থাকে সেটা প্রায়ই দূর অতীতে তলিয়ে যায়। সুতরাং আধুনিক চীন বা চীনের আধুনিক ইতিহাসের আরম্ভ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। কিন্তু গণতন্ত্রের গুরুত্ব বুঝতে হলে এর আগেকার রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অবস্থা সবিশেষ জানা দরকার, যার ফলে এতবড়ো একটা জনবিদ্রোহ হয়ে গেল। বর্তমানকে ঠিকমতো জানতে হলে নিকট অতীতকে জানতে হয়।

বিপ্লবের আগে দীর্ঘ রাজতালিকা সম্বলিত চিং বংশের রাজত্ব চলছিল। ১৬৪৪ খ্রীস্টাব্দে মাঞ্চুরা চিং বংশ প্রতিষ্ঠা করে এবং সর্বসমেত দশটি রাজার রাজত্বে ১৯১১ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। চিং রাজাদের সময় চীনের অবশ্য অনেক ঐশ্বর্য হয়। চিং বংশের প্রারম্ভে আনাম, শ্যাম, ব্রহ্ম, ভুটান ও নেপাল চীনের অধীনস্থ করদ রাজ্য ছিল। কাং-শি-এর রাজত্বকালে রুশিয়ার পিটার দি গ্রেট পিকিং-এ নজর পাঠিয়েছিলেন এবং চীনের সঙ্গে তিনি সৌহার্দ বজায় রেখেই চলতেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিয়েন্‌-লুং-এর রাজত্বের সময়ে ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড ম্যাকার্টনি ব্রিটেনরাজের শুভেচ্ছা বহন করে চীনে আসেন। মজার বিষয় এই যে তিনি সম্রাট চিয়েন-লুং এর কাছে নতজানু হন। ব্রিটেনরাজকে লিখিত চিয়েন-লুং এর চিঠি পড়ে চীনের তৎকালীন ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির কিছু আভাস পাওয়া যায়—

"তোমার প্রতিনিধি তোমার চিঠি এবং উপহার নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে; তোমার রাজভক্তি দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি, যদিও আমাদের পরস্পরের সাম্রাজ্যের ব্যবধান প্রচুর। আমি তাকে এবং তার লোকজনদের ভালোভাবে অভ্যর্থনা করবার হুকুম দিয়েছি এবং ইতিমধ্যেই আমার সাথে দেখা করবার অনুমতি তাকে দেওয়া হয়েছে।

তোমার ব্যবসাবাণিজ্য তদারক করবার জন্য কয়েকজন লোক পাঠাবার যে-প্রস্তাব করেছ তা অনুমোদন করা গেল না, কেননা সেটা আমাদের স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের আইন-বিরুদ্ধ।

আমার স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের চতুর্দিক সমুদ্রবেষ্টিত এবং আমার প্রধান কাজ হচ্ছে প্রজাপালন। দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান জিনিস আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়; তোমার প্রতিনিধি এখানে এসেই সেটা নিশ্চয় টের পেয়েছে।

বস্তুতপক্ষে আমার এই স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে কোনো জিনিসেরই অভাব নেই; সবই প্রচুর পরিমাণে এখানেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং বহির্জগতের বর্বরদের তৈরি কোনো জিনিসই আমদানি করবার আমার দরকার নেই।

প্রার্থনা করি, আমার প্রতি তোমার ভক্তি এবং আনুগত্য অটল থাকুক। তোমার রাজ্যের নিরাপত্তা এবং শান্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থেকো।"

এই সময় চীন ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের চরম অবস্থায় থাকলেও অধঃ-পতনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। চিং বংশ স্থাপনের আগে মাঞ্চুরা উত্তর-পূর্ব চীনের এক অসভ্য জাতি ছিল। ক্ষমতা পেয়েই প্রভুত্ব হারাবার ভয়ে একদিকে যেমন তারা দেশের মঙ্গল সাধন করতে লেগে গেল, অন্যদিকে আবার তেমনি নিজেদের প্রভুত্বশক্তি দৃঢ়তর করতে থাকল। কিন্তু এক শতাব্দীরও কিছু বেশি সময় রাজত্ব করবার পর ক্রমশ রাজারা চরিত্রহীন এবং রাজকর্মচারীরা অসৎ হয়ে পড়ল; অনুপযুক্ত কর্মচারীরা ঘুস নিতে আরম্ভ করল। প্রধান মন্ত্রী হো-কুন্ই এই ব্যাপারের উদাহরণ। তিনি তাঁর কুড়ি বছরের কার্যকালের ভিতর ৮০,০০,০০,০০০ তায়েল জমিয়েছিলেন, যেখানে সমগ্র সাম্রাজ্যের খাজনা বাবদ আয় ছিল মাত্র ৭০,০০,০০ তায়েল। সুতরাং উত্তর জীবনে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

করে এবং তাঁকে ফাঁসি দিয়ে সরকার ঠিকই করেছিল। কিন্তু তাঁর এই ভয়াবহ পরিণাম দেখেও কর্মচারীদের ঘুস নেবার অভ্যাস কমল না।

এর-উপর আবার দেশে কয়েকটা বিদ্রোহ দেখা দিল, যেমন "পো লিয়েন চিয়াও" অথবা "শ্বেত লিলি সংসদ" পরিচালিত এবং "থিয়েন লি চিয়াও" অথবা "স্বর্গীয় বিবেক সংসদ" সমর্থিত ধর্মবিদ্রোহ। এছাড়াও ছিল 'কোয়েই চৌ'তে মিয়াওদের বিদ্রোহ, 'সিন কিয়াং' এ মুসলমানদের বিদ্রোহ এবং দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্রতীরে জলদস্যুদের উৎপাত। এর পর খ্রীস্টধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে এল 'হুং শিউ-চুয়ান' পরিচালিত তাই-পিং বিপ্লব। হুং শিউ-চুয়ান কোয়াং টুং প্রদেশের হোয়া জিলার বাসিন্দা এবং প্রচণ্ড খ্রীস্টভক্ত ছিলেন। 'মুক্তি' এবং 'সাম্যে'র বার্তা ঘোষণা করে তিনি রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক সংস্কারের চেষ্টায় লেগে গেলেন। তাঁর কাজের প্রারম্ভে তিনি "সান্ দিয়েন হুই" অর্থাৎ ত্রি-উদ্দেশ্যমূলক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রচার করেন যে জিহোবা হচ্ছেন স্বর্গের পিতা, যিশু তাঁর বড়ো ভাই আর তিনি স্বয়ং তাঁর ছোটো ভাই। প্রথমটায় তিনি খুব সফল হয়েছিলেন এবং কয়েক বছরের ভিতরেই পনেরোটি বিভাগ তাঁর তাঁবে এসে গেল। তিনি "তাই পিং তিয়েন কুয়ো" অথবা "মহাশান্তিময় স্বর্গীয় রাজত্ব" নামে এক নূতন রাজবংশের সূচনা করেন এবং তাঁর রাজধানী হয় নানকিং। কিন্তু এই বিপ্লব ব্যর্থ হল; এটা সমগ্র চীনের সমাজ এবং সভ্যতার গোড়ায় এসে ঘা মেরে তাকে ভেঙে ফেলবার ভয় দেখাল। এই ব্যর্থতার মূলে ছিল সাধারণের সহানুভূতির অভাব। পতনোন্মুখ চিং বংশের আয়ু এতে আরো কয়েক দশক বেড়ে গেল।

এই সময়ে বিদেশীরা ক্রমাগত চীনকে আক্রমণ করতে শুরু করে। ১৮৪০ সালে তাও-কোয়াং এর রাজত্বকালে ব্রিটেনের-সঙ্গে অহিফেন

যুদ্ধ শুরু হয় এবং চীন হেরে যায়। ফলে নানকিং সন্ধিসর্ত অনুযায়ী পাঁচটি বন্দর, কোয়াংচৌ, এময়, ফুচৌ, নিংপো এবং সাংহাই বিশেষ কতৃকগুলো সুবিধা আর অধিকার সহ বাণিজ্যের জন্ত উন্মুক্ত হল। হংকং ব্রিটেনকে দান করতে হল এবং ক্ষতিপূরণও দিতে হল অনেক। চীনের উপর যতগুলো অসমান এবং অন্তায় সর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটিই তারমধ্যে সর্বপ্রথম। ১৮৬০ সালে ইঙ্গফরাসী সম্মিলিত শক্তি পিকিং শহর বোমা বিধ্বস্ত করে এই অসহায় জাতির উপর তিয়েন্-ৎসিন্ ও পিকিংএর আরো দুটি সর্ত চাপিয়ে দেয়। আরো কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং আরো কয়েকটি বন্দর উন্মুক্ত করে দিতে বাধ্য করা হয়। ১৮৯৫ সালে কোয়াং-শু এর রাজত্বকালে জাপান চীনকে পরাভূত করে প্রচুর ক্ষতিপূরণ নেয়, ফরমোসা দখল করে এবং আরো কয়েকটি বন্দর বাণিজ্যের জন্য মুক্তসর্ত করে নেয়। চীনের করদ রাজ্য কোরিয়াকে নামে মাত্রই স্বাধীন করে দেওয়া হয়; আসলে কিন্তু এটি জাপানেরই অধীনে চলে আসে। ১৯০০ সালে বক্সার বিদ্রোহের সময় ব্রিটেন, রুশিয়া, জাপান, জার্মানি ফ্রান্স, আমেরিকা, অষ্ট্রিয়া এবং ইটালির সম্মিলিত শক্তির নিকট চীন শেষবারের মতো পরাজিত হয়। চিং রাজত্ব এবার চরমতম দুর্দশার সম্মুখীন হল এবং এই সময়েই হল ১৯১১ সালের মহাবিপ্লবের সূচনা।

গণবিপ্লব ও গণতন্ত্র

মহাবিপ্লবের কথা বলবার আগে এর নেতা ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেন এর সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া দরকার।

ডাঃ সান্ ১৮৬৬ সালে কোয়াং-টুং বিভাগের চুং-শান্ জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বালক বয়সে 'তাই পিং' বিপ্লবের নেতা হুং শিউ-চুয়ান

এর গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে তিনি ভাবতেন যে বড়ো হয়ে তিনিও ঐরকম হবেন। বড়ো হয়ে মাঞ্চু শাসনের অবনতি এবং জাতীয় দুর্গতি দেখে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং এর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ উভয় পক্ষই তাঁকে ভয়ানক ধরনের বিপ্লবী নেতা বলে মনে করতে লাগল। হংকং মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে দৃশ্যত তিনি কোয়াংচো এবং ম্যাকাও-এ ডাক্তার হয়ে বসলেন, কিন্তু বিপ্লবী মত প্রচার করাই তাঁর প্রধান কাজ হল। তিনি কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এবং অনেক ব্যক্তির সহানুভূতি অর্জন করলেন এবং ১৮৯৪ অব্দে বিপ্লবকেন্দ্র শিন্ চুং হুই প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৯৫ অব্দে জাপানের কাছে হেরে যাওয়াতে জনসাধারণের কাছে গভর্ণমেণ্ট হেয় হয়ে পড়ল। এই সুযোগে ডাঃ সান্ ক্যান্টন্-এ করলেন প্রথম আঘাত। কিন্তু তাঁর আয়োজনের কথা জানাজানি হয়ে যাওয়াতে অকৃতকার্য হয়ে তাঁকে দেশ থেকে পালাতে হল। জাপান এবং আমেরিকা হয়ে তিনি ইউরোপে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু যেখানেই গেলেন সর্বত্র প্রবাসী চীনাদের কাছে তাঁর উদ্দেশ্য প্রচার করে চললেন। চিং গভর্ণমেণ্টের কাছে ক্রমশ তিনি এক উৎপাতবিশেষ হয়ে দাঁড়ালেন এবং ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে চীনা দৌত্য বিভাগ তাঁকে ধরে লুকিয়ে রাখল। কিন্তু তাঁর শিক্ষক মিঃ জেম্‌স্ ক্যাণ্ট্‌লির চেষ্টা ও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চাপে বাধ্য হয়ে তাঁকে মুক্তি দিতে হল। তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে 'আমার সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারের কাহিনী' নামে তিনি একটি বই লিখলেন এবং এর জনপ্রিয়তায় তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়লেন।

ডাঃ সান্ প্রথমে শুধু মাঞ্চু শাসন বিপর্যস্ত করে গণতন্ত্র স্থাপনের কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁর ইয়োরোপ-নির্বাসনের সময় তিনি গভীরভাবে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে

উপলব্ধি করলেন যে জাতীয় উন্নতির এই সব অন্তরায় দূর না করলে বিপ্লব কখনও ফলপ্রসূ হবে না। এই থেকে তাঁর লক্ষ্য হল 'সান্ মিং চু য়ি' অর্থাৎ তিনটি জাতীয় উপাদান, অথবা জাতির উন্নতির মূলগত তিনটি বিষয়; রাজ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ঐক্য বা নিরপেক্ষতা রক্ষা। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন:

"গ্রেপ্তারের থেকে উদ্ধারের পর আমি দুবছর ইয়োরোপে ছিলুম। ইয়োরোপের নানাবিধ প্রতিষ্ঠান এবং সব রকম আচার ব্যবহারের অনুসন্ধান করে এবং উচ্চনীচ ভেদে সকলের সঙ্গে সামাজিক সংযোগের ভিতর দিয়ে আমি দেখতে পেয়েছি যে ও-দেশের লোকেরাও তাদের শক্তি সামর্থ্য বা সাধারণতন্ত্রের আস্ফালন সত্ত্বেও এমন কিছু সুখে স্বচ্ছন্দে নেই। সর্বত্রই আমি সমাজসাম্যবাদের জন্য মারামারি হতে দেখেছি। আমি আমার দেশকে এরকম ভয়াবহ পরিণাম থেকে বাঁচাবার আকাঙ্ক্ষায় জাতীয়তাবাদ এবং সাধারণতন্ত্রের সাথে সাথে জাতীয় জীবনযাত্রার আভাস দিতে চেষ্টা করেছি।"

ডাঃ সান্ কৃত জাতীয় জীবনের তিনটি সূত্র (সান্ মিং চু য়ি) হচ্ছে মিং ৎসু চু য়ি, অর্থাৎ জাতির স্বাধীনতা বা জাতীয়তার সূত্র; মিং চুয়ান চু য়ি, অর্থাৎ জাতির শাসনপ্রণালী বা সাধারণতন্ত্রের সূত্র; মিং শেন চু য়ি, অর্থাৎ জাতির জীবনযাত্রাপ্রণালী বা সমাজ সাম্যবাদের সূত্র।

জাতির স্বাধীনতা বা জাতীয়তার সূত্র বলতে ডাঃ সান বুঝতেন জাতিগত ঐক্য। এর দ্বিবিধ অর্থ; এর উদ্দেশ্য মূলত সমগ্র চীনের অধিবাসী সর্বপ্রকার জাতির নাগরিক জীবনের ঐক্যসাধন, বাহ্যত পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ভিতর আন্তর্জাতিক সাম্যস্থাপন।

জাতির শাসনপ্রণালী বা সাধারণ তন্ত্রের সূত্র বলতে দুটি জিনিস বোঝায়; রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক অধিকার এবং কেন্দ্র থেকে সরকারী

শক্তির অপসারণ। প্রথমটির জন্ম চাই চারটি বিশেষ অধিকার (১) নির্বাচনের ক্ষমতা, (২) প্রত্যাহারের ক্ষমতা, (৩) মতামত দানের ক্ষমতা এবং (৪) বিচারের দাবি। গভর্ণমেন্টের শক্তির আবার পাঁচ রকম প্রকাশ (১) ব্যাবস্থাপক, (২) বিচারক, (৩) কার্যকারক, (৪) অনুসন্ধান এবং (৫) নিয়ন্ত্রণ।

জাতির জীবনযাত্রাপ্রণালী বা সমাজ-সাম্যবাদের সূত্রকে উদার এবং ব্যাপক সমাজ-সাম্য-কামনা বলা যেতে পারে ;— সমাজসাম্যের বিস্তীর্ণ এবং সমষ্টিগত রূপের প্রকাশ। এই সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতায় ডাঃ সান্-এ'র ব্যাখ্যায় বলেছিলেন "'মিং-শেন' বলতে প্রধানত জাতির জীবিকা-প্রণালীই বোঝায়; এর আরেক অর্থে আমরা বুঝি সাধারণের জীবন, যার উপর সমাজ বা জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে। এই সূত্র ধরে আমি এমন একটি বৃহৎ সমস্যার সমাধান করতে চাই যা প্রায় এক শতাব্দী ধরে ইয়োরোপকে ভীষণ ভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। আমি সামাজিক সমস্যার কথাই বলছি, সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে গিয়ে সমাজ সাম্য, অধিকার সাম্য বা বিরাট একটা ঐক্য সূত্রে।"

কিন্তু যে সমাজসাম্য বা সোশ্যালিজম্ ডাঃ সান্ প্রচার করলেন সেটা হল কার্ল মার্ক্স-এর সামাজিক দর্শন অথবা সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজসাম্য বা অধিকারসাম্যের প্রয়োগের থেকে আলাদা। তিনি বলতেন যে কার্ল মার্ক্স সমাজের রোগনির্ণয় করতে পারলেও এর শারীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং তাঁর গবেষণাতে রোগ ধরা পড়লেও প্রতিকারের কোনো কার্যকরী ইঙ্গিত নেই। কিন্তু এই সমাজসাম্যবাদ-সূত্রে সে-অভাব ছিল না। এর জন্ম দুটি জিনিস প্রয়োজন; মূলধন নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমির অধিকারে সাম্য। প্রত্যেকটি লোককেই কাজ করতে হবে, চাষ করতে হবে, কিন্তু কেউ জমির বা

অর্থের মালিক থাকবে না। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি থাকবে গভর্ণমেণ্টের হাতে, আর দেশের সংস্কার ইত্যাদি কাজও গভর্ণমেণ্টই করবে যাতে সকলেই আনন্দে থাকতে পারে। ডাঃ সানের এই সূত্রটি হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদের চৈনিক সংস্করণ।

'সান্ মিং চু য়ি' প্রণয়ন শেষ করে তিনি তার প্রচারের জন্য ইয়োরোপ ছেড়ে জাপানে গেলেন। তিনি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করে প্রবাসী চীনাদের উদ্‌বুদ্ধ করেন এবং বৈদেশিক জাতিদের সহানুভূতি পাবার চেষ্টা করেন। ১৯০৫ সালে তিনি আবার ইয়োরোপে তাঁর বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন, প্রথমে ব্রুসেলস্, পরে ক্রমান্বয়ে বার্লিন, প্যারিস এবং টোকিয়োতে। দলটির নাম হল 'চুংকুয়ো কে মিং তুং মেং হুই' অথবা 'চীনা বিপ্লবী সম্মেলন'। এর সদস্যেরা দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থেকে কাজ করতেন এবং যদিও সব ব্যাপারেই তাঁরা কৃতকার্য হতেন না, তাঁদের এই অকৃতকার্যতা তাঁদের সংকল্পকে দৃঢ়তর এবং চালগুলিকে কূট ও হুঁশিয়ারি করে তুলেছিল।

সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হয় ক্যানটনে— ১৯১১ সালের ২৯ মার্চ তারিখে, যার ফলে ৭২ জন বীর যুবকের প্রাণনাশ হয়। ক্যান্টনের কাছে একজায়গায় তাঁদের কবর 'পীতপুষ্প সমাধি' নামে পরিচিত এবং আজকাল চীনাদের কাছে সেটা তীর্থস্থান। কিন্তু এই বছরই ১০ অক্টোবর তারিখে হু-পেই প্রদেশের উ-চাং শহরে অকস্মাৎ মহাবিপ্লবের বহ্নি জ্বলে উঠল। এক মাসের মধ্যে দশটি প্রদেশে বিদ্রোহের পতাকা উড়ানো হল। ডাঃ সান্ কিন্তু তখনও বিদেশে। সকলের আগ্রহে তিনি সে-সময় দেশে ফিরে এসে সাংহাই-এ প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের একটি সভা আহ্বান করলেন। সেখানে স্থির হল যে নানকিং-এ সাময়িকভাবে একটি গভর্ণমেণ্ট খাড়া করা হবে এবং ডাঃ

সান্ হবেন চীন গণতন্ত্রের অস্থায়ী অধিনায়ক। ১৯১২ সালের পয়লা জানুয়ারি নান্‌কিং-এ গভর্ণমেন্টের যথোচিত উদ্বোধন হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ চান্দ্র পঞ্জিকা তৈরি হল এবং ১৯১২ সালই হল বিপ্লব যুগের প্রথম বছর। সেনানায়ক হোয়াং-শিং, ডাঃ উ তিং-ফাং এবং ডাঃ ৎসাই য়ুআন-পেই প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়ে এক সংসদ গঠিত হল। তারপর সব প্রদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্লামেণ্টেরও পত্তন করা হল। ১১ মার্চ অধিনায়ক ৫৬ দফার একটি অস্থায়ী শাসনবিধি পেশ করলেন। এর তিনটি বিশেষ ঘোষণা ছিল: চীনদেশ হচ্ছে দেশবাসীদের দ্বারা গঠিত গণতন্ত্র বা রিপাব্লিক; রাজশক্তির অধিকার সর্বসাধারণ্যে ব্যাপ্ত; এবং জাতি, শ্রেণী বা বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার।

নান্‌কিং-এ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের আগে নিয়মতান্ত্রিক প্রণালীর আশ্রয়ে মাঞ্চুরাজ একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। বিতাড়িত সেনাপতি য়ুআন শি-কাই কে দেশরক্ষা এবং নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য আহ্বান করা হল। য়ুআন এসে একাধারে প্রধান মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি হয়ে দক্ষিণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন-দমনে কৃতসংকল্প হলেন। য়ুআন ছিলেন যশোলিপ্সু এবং বিশ্বাসঘাতক। তিনি একদিকে যেমন অসহায় সম্রাটকে এই দুরবস্থার জন্য ভয় দেখিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করতে বললেন আবার তেমনি রাষ্ট্রনায়ক সান্ ইয়াৎ-সেনকে প্রতারণা করে বললেন যে তিনি গণতন্ত্রের সৈন্যদলকেই সাহায্য করবেন— যদি নায়কের পদটি তাঁকে দেওয়া হয়। উদারপ্রকৃতি ডাঃ সান্ এই অনুরোধে সম্মত হলেন। এইভাবে ১৯১৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি শিশু রাজা শিয়েন তুং অথবা পু-য়ি সিংহাসন পরিত্যাগ করে নূতন গভর্ণমেণ্টের দয়াজীবী হয়ে পড়ল; আর পরদিন সকালে (১৩ ফেব্রুয়ারি) ডাঃ সান্ পদত্যাগ করে য়ুআনকে রাষ্ট্রনায়কের পদে বরণ করলেন। ডাঃ সানের একমাত্র লক্ষ্য ছিল

মাঞ্চুদের বিতাড়িত করে গণতন্ত্র সংস্থাপন— নিজস্ব কোনো যশোলিপ্সা বা শক্তিস্পৃহা তাঁর ছিল না। তাঁর অধিনায়কপদের উদ্‌বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হলেই আমি পদত্যাগ করব।" তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিনষ্ট হবার সাথে সাথে চীনের ইতিহাসের আর একটি নূতন অধ্যায় শুরু হল।

গণতন্ত্র স্থাপনের পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা

যে কোনো বড়ো আন্দোলন সফল করতে গেলে উদ্যোক্তাদের সেজন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে হয়; ভবিতব্যকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সাফল্যের আগে বা পরে যখনই হোক মূল্য এজন্য দিতে হবেই। চীনের বিপ্লব প্রায় বিনা বাধাতেই সফল হতে চলেছিল; রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে পরিবর্তন প্রায় বিনা রক্তপাতেই হল। বোধ হয় এখানেই বিপ্লবের এমন কিছু দুর্বলতা ছিল যার জন্য চীনকে এর পর হতে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে।

ডাঃ সানের তৈরি কার্যক্রম অনুযায়ী রাষ্ট্রিক সংস্কারের তিনটি সোপান নির্দিষ্ট ছিল। তার প্রথমভাগে শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা বিনাযুদ্ধে হওয়া সম্ভব নয়। গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের পর দ্বিতীয় সোপান রাষ্ট্রপরিচালনা বা রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুবর্তনের শুরু। এই সময়টাতে গভর্ণমেণ্ট দেশের লোকের রাষ্ট্রিক ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে, যাকে বলা যেতে পারে রাষ্ট্রিক অভিভাবকতা। তৃতীয় অধ্যায়টা হবে নিয়মতান্ত্রিক, যখন দেশবাসীদের গভর্ণমেণ্টের কাজ পরীক্ষা করবার অধিকার জন্মাবে এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়েই তৈরি হবে গভর্ণমেণ্ট।

এই তিনটি সোপান পার না হয়ে এলে কোনো গণতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, আর সম্ভব হলেও তার ভিতর রাজতন্ত্রের আভাস থেকেই যাবে। দুর্ভাগ্যবশত চীনের এই বিপ্লব বাইরে থেকে যতটা সফল এবং সুষ্ঠু মনে হয়েছিল আসলে তার ভিত্তি ততটা দৃঢ় হয়নি ; এই কারণে আবার শুরু হল গোলমাল। এই উপলক্ষে ডাঃ সান্ তাঁর 'চীনা বিপ্লবের ইতিহাস' এ লিখেছেন :

"এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে রাষ্ট্রসংগঠনের তিনটি পর্যায় যথাক্রমে সামরিক অধিকার, রাষ্ট্রিক অভিভাবকতা এবং নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট স্থাপন, এইগুলির সময় সংক্ষেপন ঘটেছিল। ফলে দেশে যে দুর্ঘটনাগুলি ঘটল তার জন্য দায়ী জনকয়েক বিপ্লবী নেতার অদূরদর্শিতা।"

য়ুআনের যান্ত্রিকতা এবং একগুঁয়েমিতে নানকিং এর বদলে পিকিং হল রাজধানী। অস্থায়ীরূপে অধিনায়কের পদ পেয়ে তিনি আড়ম্বর সহকারেই নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের নিদর্শন স্বরূপ পার্লামেণ্ট আহ্বান করলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর প্রভুত্ব লিপ্সার প্রতিবন্ধক স্বরূপ আইনকানুনগুলির সংশোধনে তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন। তিনি বিপ্লবের কোনো কোনো নেতার উপর এত বেশি বৈরভাব পোষণ করতেন যে তাঁর হুকুমে এঁদের অনেককেই হত্যা করা হয়। এটা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল যে য়ুআন গণতন্ত্রের সমর্থক নন, এই সুযোগে তিনি তাঁর নিজের উন্নতি করে নিতে চান। নবজাত গণতন্ত্রের এই বিপদ দেখে ডাঃ সান্ 'চুং হোয়া কে মিংতাং' অথবা 'চীনের বিপ্লবীদল' নাম দিয়ে একটি নূতন দল গড়ে য়ুআনকে সতর্ক হতে বললেন। য়ুআন তাঁর প্রভুত্বস্বপ্নে এত বিভোর ছিলেন যে ভাবলেন এবার যা খুশি তাই করা সম্ভব। দুঃসাহস তাঁর চরমে পৌঁছল যখন ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে তিনি গণতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘোষণা করে নিজে রাজা হয়ে আবার রাজতন্ত্র

প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হলেন, এবং ১৯১৬ সালের পয়লা জানুয়ারি তাঁর প্রকাশ্য অভিষেকের দিন স্থির করলেন। এই ঘোষণার সাথে সাথে সেনানায়ক ৎসাই-ঙো এবং লি লিএ-চুন এর নেতৃত্বে দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশ-গুলিতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু এসে য়ুআনকে লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল; তাঁর রাজকীয় স্বপ্ন আর বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করতে পেল না।

য়ুআনের মৃত্যুর পর ডাঃ সান বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে একত্রিত করে গণতন্ত্রের একটা কার্যকরী খসড়া তৈরি করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু জনসাধারণ এত ভীত হয়ে পড়েছিল যে তিনি এ বিষয়ে পুরোপুরি সফল হলেন না। য়ুআনের প্রেতাত্মা যেন অনেকের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল এবং মাঞ্চুদের পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য যেসব চেষ্টা চলতে লাগল তার অধিকাংশই হাস্যকর। এই সব চেষ্টা সফল না হলেও কতকগুলি যুদ্ধামোদী সম্প্রদায় সৃষ্টি হল এবং দেশের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে উত্তর অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো বহু যুদ্ধপ্রিয় সর্দার গজিয়ে উঠল। দেশকে এরা ভুলেও ভালোবাসত না, নিজেদের স্বার্থের জন্য এরা যা খুশি তাই করত; ফলে অবিরাম বাধা দিয়ে দিয়ে দেশের অবস্থা এরা একেবারে সঙিন করে তুলল। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রদেশগুলি দল করে অনেক বছর পিকিং গভর্ণমেণ্টকে বাধা দিয়েছিল। অন্তর্যুদ্ধে দেশটা ভরে গেল আর সে সময় মনে হল যেন চিরদিনের জন্য চীনের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা লুপ্ত হল।

আভ্যন্তরীণ গোলমালের সুযোগে সাধারণত যে কোনো দেশকেই বিদেশীরা এসে আক্রমণ করে। য়ুরোপীয় যুদ্ধ এবং য়ুআন শী-কাই এর বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়ে জাপান চীনকে আক্রমণ করে জার্মানির ইজারাপ্রাপ্ত প্রদেশ কাও-চৌ প্রণালী দখল করল এবং কাও-চি রেলপথ

কেড়ে নিল। চীনও যে সম্মিলিত জাতিদের হয়েই যুদ্ধ করছে এটা তাদের কিছুতেই বোঝানো গেল না। তারা যুআন শী-কাই এর গভর্নমেণ্টকে গোপনে একুশটি সর্তযুক্ত এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করল, যেগুলো পুরোপুরি মেনে নিলে চীনকে বরাবর জাপানের দাসরাজ্য হয়ে থাকতে হয়। যুআন সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখছিলেন; তিনি এই জাতীয় লাঞ্ছনাপত্রে স্বাক্ষর দেওয়াই স্থির করে ভাবলেন জাপান তাঁর কথাটা নিশ্চয়ই পরে বিবেচনা করে দেখবে। চীনের অবনতির চূড়ান্ত হল ১৯১৫ সালের ৯ মে তারিখে, যখন তিনি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে স্বদেশের স্বাধীনতা বিক্রয় করে দিলেন। এই ব্যাপারে সমগ্র দেশ ঘৃণায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল; আর অন্যান্য দেশেরও চোখ খুলল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র চীনের প্রতি জাপানের এই রাজনৈতিক আচরণের প্রতিবাদ করল। চীনের লোকেরা আজও ঐ দিনটিকে চরম আত্মাবনমনের দিন বলে বিবেচনা করে, যদিও জাপানের দাবিগুলো কোনোদিনই ফলপ্রসূ হয়নি।

জাপানের উদাহরণে পশ্চিমের লোভী জাতিরাও চীনে এসে সুবিধা করে নিতে চাইল এবং এই অরাজকতার সুযোগে বিভিন্ন ভুঁইয়াদের সাহায্যদান করে পরস্পরের ভিতর যুদ্ধ করবার জন্য উত্তেজিত করতে লাগল। এই সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং চৈনিক সমস্যার মীমাংসার জন্য ১৯২১ সালের ১ জুলাই যথাক্রমে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইটালি, পর্তুগাল, গ্রেট ব্রিটেন, জাপান, হল্যাণ্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন, এই নয়টি জাতির প্রতিনিধিদের নিয়ে ওয়াশিংটন-এ এক শান্তিসভা (প্যাসিফিক কনফারেন্স) আহ্বান করলেন। এই সভা এক সমাধানে এসে পৌছল এবং চীন সম্পর্কে এই নব-শক্তি এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করল। এই চুক্তির উল্লেখযোগ্য সর্তগুলি হচ্ছে:—চীনের

প্রভুত্ব, স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রিক ও শাসনগত অখণ্ডতাকে স্বীকার করা ; চীনকে তার স্থায়ী ও কার্যকরী গভর্নমেণ্ট স্থাপনের পূর্ণ এবং অবাধ সুবিধা দান ; চীনরাষ্ট্রের ভিতর সব জাতিকে ব্যবসাবাণিজ্যের সমান সুবিধাদানের ব্যাপারে ক্ষমতার ব্যবহার। চুক্তিপত্রটি চীনের উপকারকল্পে প্রস্তুত হলেও প্রকৃতপক্ষে চীনে অন্যান্য জাতির বাণিজ্যগত সুযোগসুবিধাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। উপরন্তু চীনের মতো এক গৌরবমণ্ডিত জাতির আত্মসম্মানেও এই সর্তগুলি আঘাত করেছিল। কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায়ই তখন ছিল না।

চীনের লোকেরা এবার বুঝতে পারল যে যুদ্ধপ্রিয় সর্দারদের উচ্ছেদ না করলে শান্তি নেই, ভুঁইয়াদের শক্তি নির্মূল না করা পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনো আশা নেই এবং একটি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট ছাড়া বিদেশী শক্তিকে বাধা দেওয়াও সম্ভব নয়। চীন গণতন্ত্রের জনক ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেন আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করে দেশবাসীদের দ্বিতীয় মহাবিপ্লবের পথে পরিচালিত করলেন।

চীনের রাজনীতিতে নবযুগের আরম্ভ

ডাঃ সান তাঁর রাজনীতিক জীবনের সূচনায় ১৮৯৪ সালে হনলুলুতে শিন চুং হুই নামে প্রথম যে বিপ্লবী দল গড়েছিলেন, ১৯০৪ সালে তার আয়তন বাড়িয়ে নাম রাখা হল 'চুংকুয়ো কে মিং তুং' অর্থাৎ চীনা বিপ্লবী সম্মেলন। ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে এর কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে বহু বাদানুবাদের পর অবশেষে টোকিয়োতে হল এর প্রধান কেন্দ্র। এই দলটির জন্যই চীনে মাঞ্চু রাজত্বের উচ্ছেদ এবং গণতন্ত্রস্থাপন সম্ভব হয়েছিল। য়ুআনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ১৯১৪ সালে 'চুং হোয়া কে মিং তাং' নাম দিয়ে টোকিয়োতে ডাঃ সান আরেকটি বিপ্লবীদল গড়ে চীনকে

য়ুআনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কবল থেকে বাঁচান। য়ুআনের মৃত্যুর পর উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধোদী লোভী সর্দারেরা নিজেদের ভিতর মারামারি আরম্ভ করে দেশে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলল। এদের কবল থেকে চিরকালের মতো দেশকে বাঁচাবার জন্য এবং বৈপ্লবিক শক্তি-গুলিকে একতাবদ্ধ করবার জন্য ডাঃ সান নূতন করে আরেকটি বিপ্লবীদল গড়ে তার নাম দিলেন 'চুংকুয়ো মিং তাং' অথবা চীনের জাতীয় দল। বৃদ্ধ, চরিত্রহীন, কর্তব্যজ্ঞানহীন সেনাপতিদের হাতে সমর বিভাগের ভার না দিয়ে তিনি সদ্বিবেচনার কাজ করেছিলেন। শীঘ্রই গণতন্ত্রের সমর বিভাগে যুবকদের শিক্ষার জন্য সেনানায়ক চিয়াং কাই-শেক এর অধিনায়কত্বে হোয়াং-পু সমর বিদ্যালয় নামে একটি সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল। এই প্রতিষ্ঠানটিই সমস্ত আয়োজনকে সফল করে তুলবার মূল ছিল।

কুয়ো মিং তাং (চুংকুয়ো মিং তাং এর ব্যবহারিক অপভ্রংশ) নবকলেবর গ্রহণের পর তার কেন্দ্র ক্যানটনে অপসারিত করা হল। এখানে জাতীয়তাবাদী, সাম্যবাদী, বিপ্লববাদী সবরকম লোককে একত্রিত করে অবিচ্ছেদ্য আদর্শের বন্ধনে বেঁধে সকলকে নিয়ে একটিমাত্র দলের অস্তিত্ব ঘোষণার চেষ্টা করা হয়। ১৯২৩ সালে এই দলের একটি সম্পূর্ণ নিয়মতালিকা প্রস্তুত হয়ে গেল এবং ডাঃ সানের অধিনায়কত্বে ক্যানটনে সামরিক গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা হল। ডাঃ সানকে চরম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিয়ে অন্যান্য নেতারা রইলেন তাঁরই আদেশাধীন। ইতিমধ্যে উত্তরাঞ্চলে অভিযানের জন্য প্রচণ্ড রকমের আয়োজন হতে লাগল। এই সময়ে একটা খুব অনুকূল ঘটনা ঘটে। একদা খ্রীস্টান-সেনাপতি নামে পরিচিত যোদ্ধপতি উ পেই-ফু এর অধীনস্থ সেনানায়ক ফেং য়ু-শিয়াং অন্তর্যুদ্ধ অবসানের জন্য তাঁর প্রভু উ-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তুয়ান

চি-জুয়েই নামে এক নেতাকে উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক করতে চেষ্টা করলেন এবং এই সব ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্ম ডাঃ সানকে পিকিং-এ আমন্ত্রণ করলেন। উত্তরবাসীদের অনুভঙ্গ দেখে ডাঃ সান রাজি হলেন এবং জাপান হয়ে পিকিংএ গেলেন। যাবার আগে তিনি একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করলেন যাতে নিম্নলিখিত তিনটি অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ ছিল; প্রথম, সমস্ত অসমান চুক্তিকে অস্বীকার করা; দ্বিতীয় যোদ্ধপতিদের উচ্ছেদ এবং দেশের সামরিক শক্তিকে পুরোপুরি দেশবাসীদের হাতে নিয়ে আসা; তৃতীয়, 'সান মিন চু য়ি' অনুযায়ী দেশের সংস্কার ও পুনর্গঠন। জাপানে সকলের অনুরোধে তিনি বৃহৎ এসিয়ার পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন; এই বক্তৃতা নিয়ে তখন বহু জল্পনা কল্পনার উৎসমুখ উদ্ঘাটিত হয়। কিন্তু চীনের চরম দুর্ভাগ্য যে ডাঃ সান তাঁর অতুল পরিশ্রম এবং কষ্টভোগের ফলে ১৯২৫ সালের ১২ মার্চ তারিখে অকস্মাৎ মারা যান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু জাতীয় দলকে যেন পঙ্গু করে ফেলল এবং দেশে আবার বহু বাধা-বিঘ্ন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হল।

ডাঃ সান-এর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর কুয়োমিংতাং ক্যানটনে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করল, আর ওয়াং চিং-ওয়েই হলেন রাষ্ট্রপতি। ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে নিখিল চীন কংগ্রেস অধিবেশন হয়, এবং সেখানে চিয়াং কাই-শেক উত্তর গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় জাতীয় সৈন্যদলের প্রধান সেনাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। জুলাই মাসে ক্যানটন থেকে অভিযান শুরু হয় এবং কয়েক মাসের মধ্যেই য়িআং-ত্সু নদীর দক্ষিণস্থ সমগ্র প্রদেশ চিয়াং-এর হাতে এসে যায়। ১৯২৭ সালে রাজধানী নানকিং-এ স্থানান্তরিত করা হয়; সেই থেকে নানকিংই চীনের রাজধানী রয়েছে। ১৯২৮ সালের মধ্যেই সমগ্র

দেশ জাতীয় গভর্ণমেন্টের তাঁবে এসে গেল। চীনের ইতিহাসে জাতীয় সামরিক অভিযানের সাফল্যের মতো কোনো ঘটনা আর ঘটেনি। যোদ্ধৃপতিদের উচ্ছেদের সাথে সাথেই ডাঃ সানকৃত গণতন্ত্র সংগঠনের প্রাথমিক অধ্যায় শেষ হল, এবং এর পরে দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ রাষ্ট্রিক অভিভাবকতা বা রাষ্ট্র পরিচালনের আরম্ভ হল।

এই সময়ে চীনের সফলতার প্রতিকূল ছিল দুটি জিনিস; প্রথমত চীনে রাজ্যদখলের জন্ত জাপানের হীন প্রচেষ্টা, দ্বিতীয়ত মস্কৌ তৃতীয় আন্তর্জাতিক দলের প্রচার কার্য।

যখনই চীনে অন্তর্বিরোধ দেখা দিয়েছে তখনই তার উপর বৈদেশিক আক্রমণ শুরু হয়েছে। জাতীয় সামরিক অভিযানের জয়লাভে দৃশ্যত চীনে পরিপূর্ণ ঐক্য স্থাপিত হল। ফলে জাপানীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় দেখে অবিলম্বে তারা শানটুং প্রদেশ আক্রমণ করে রাজধানী ৎসিনান দখল করে সামরিক অভিযানকে বাধা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু কৃতকার্য হল না। ১৯৩১ সালে ইয়াংৎসি বন্যার সুযোগ নিয়ে জাপান আবার পূর্বাঞ্চলের প্রদেশত্রয় আক্রমণ করে জেহোল দখল করল এবং 'মাঞ্চুকুয়ো' নামক অপূর্ব রাজ্যটি স্থাপন করল, (যাকে বলা যায় জাপানী নির্ধারিত-দায়িত্ব-প্রতিষ্ঠান) এই সব ব্যাপারে জাপান অবশ্য চীনের একটা বিশেষ উপকার এই করেছিল যে সমস্ত দেশ জাতীয়তায় প্রণোদিত হয়ে বিদেশীদের প্রতিরোধে সংহত হয়ে উঠেছিল।

কম্যুনিষ্টদের ইচ্ছাটা ছিল আবার অন্ত ধরনের। কুয়োমিংতাং-এর সাথে কম্যুনিষ্ট দলের বিরোধকে কোনো প্রকারেই সমর্থন করা যায় না। কম্যুনিষ্টদের অধিকাংশই ছিল সুচতুর এবং সাহসী যুবক। প্রথমে তারা স্বেচ্ছায় ডাঃ সানের কুয়োমিংতাং এর নিয়মাবলী মেনে নিল; কিন্তু পরে বোঝা গেল এটা তাদের একটা পাকা চাল। তারা কুয়োমিংতাং-এর

উদ্দেশ্যকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে খাটাতে লাগল এবং অবশেষে অবশ্যম্ভাবী বিরোধ আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯২৭ সালে দলপতিরা বাধ্য হয়ে এদের কুয়োমিংতাং থেকে বহিষ্কৃত করে দিলেন। ফলে তারা চীনা কম্যুনিষ্ট দলের গোড়াপত্তন করে প্রকাশ্যে জাতীয়তাবাদী দলের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিল; এবং কিয়াংশি প্রদেশে চীনা সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে কল্পনাপ্রবণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব চালাতে লাগল যার একমাত্র লক্ষ্য হল বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সংহার সাধন। অবিলম্বে কুয়োমিংতাং সৈন্য কিয়াংসি সোভিয়েট গভর্নমেণ্টকে আক্রমণ করে তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করল। কিন্তু জাতীয় গভর্নমেণ্ট কম্যুনিষ্টদের উপর কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি; তাদের ভিতর অনেকেই নিজেদের ভুল বুঝে কুয়ো মিং তাং-এ এসে যোগ দিয়েছে।

এসব অসুবিধা সত্ত্বেও উত্তরের সামরিক অভিযান সফল হয়েছে। জাতীয় গভর্নমেণ্ট আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সমগ্র চীন তারই অধীন। মনে হয়, কম্যুনিষ্টদের বিরোধিতা আর জাপানীদের আক্রমণ যদি না ঘটত তবে চীনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হত।

অধুনাতন সরকারের রাজ্যশাসন-প্রণালী

আগেই বলা হয়েছে যে উত্তরাঞ্চলে সামরিক অভিযানের শুরুতেই জাতীয় গভর্নমেণ্ট নানকিং-এ স্থানান্তরিত হয় তারপর আরো কিছু সংস্কার কার্যের পর আরম্ভ হল রাষ্ট্রিক অভিভাবকত্ব ও রাষ্ট্রপরিচালনের আয়োজন। ১৯৩১ সালে মে মাসে নানকিং-এ একটি জাতীয় প্রতিনিধি সভা আহূত হল; সেখানে এই অভিভাবকীয় গভর্নমেণ্টের অস্থায়ী নিয়মাবলীর পত্তন করা হল। ডাঃ সান্-এর জাতিসংগঠনের সূত্রগুলিই ছিল এইসবের ভিত্তি। এই সভাতে জাতীয় গভর্নমেণ্টের কার্যকরী

নিয়মাবলীরও সংশোধন করা হল, যাতে অস্থায়ী শাসনপ্রণালীর সঙ্গে এর ঐক্য থাকে। এই সংশোধিত নিয়ম অনুসরণ করে রাষ্ট্র চালনার ভার কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের উপর ন্যস্ত হল। কেন্দ্রস্থ গভর্নমেণ্টের প্রধানকে বলা হবে রাষ্ট্রনায়ক বা চেয়ারম্যান, এবং এই পদে বয়োবৃদ্ধ এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিই মনোনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। রাজ্যের পরিচালক হলেও আসলে তাঁর কোনো রাষ্ট্রিক দায়িত্ব নেই। জাতীয় গভর্নমেণ্টের পাঁচটি মন্ত্রীমণ্ডল বিভাগ আছে, তাদের বলা হয় য়ুআন। এই পাঁচটি য়ুআন যথাক্রমে: (১) কার্যকারক (Executive) য়ুআন, (২) ব্যবস্থাপক (Legislative) য়ুআন, (৩) বিচার (Judicial) য়ুআন, (৪) পরীক্ষক বা পরিদর্শক (Examination) য়ুআন, এবং (৫) নিয়ন্ত্রণ (Control) য়ুআন। প্রত্যেক য়ুআনের একজন অধিনায়ক বা প্রেসিডেণ্ট, একজন সহকারী অধিনায়ক বা ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, এবং জনকয়েক মন্ত্রী আছে। কার্যকারক য়ুআনে মন্ত্রীসংখ্যা বেশি এবং অন্য চারিটি য়ুআন থেকে এর ক্ষমতাও অধিক। এই বিভাগকে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেটের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যদিও এদের কার্যগত বিভেদ প্রচুর। এই পাঁচটি স্বতন্ত্র য়ুআন ডাঃ সান্ কৃত পঞ্চশক্তি গভর্নমেণ্টের অধীনে একত্রীভূত; এরা স্বতন্ত্রভাবে কুয়ো মিং তাং-এর উপর নির্ভরশীল। য়ুআনগুলি বাদেও বিশেষ-বিশেষ কাজের জন্য কতকগুলি স্বনিয়ন্ত্রিত বিভাগ আছে; যেমন জাতীয় পুনর্গঠন সমিতি, জাতীয় সামরিক সংসদ, জাতীয় অর্থনৈতিক সংসদ এবং চীন প্রতিষ্ঠান বা একাডেমিয়া সিনিকা। স্থানীয় বা লোক্যাল গভর্নমেণ্টগুলি হচ্ছে প্রাদেশিক ও জিলা গভর্নমেণ্ট, বিশেষ শক্তিসম্পন্ন মিউনি-সিপ্যালিটি এবং সাধারণ নাগরিক সভা। প্রাদেশিক এবং বিশিষ্ট নাগরিক বা মিউনিসিপ্যাল সভাগুলি সরাসরি কার্যকারক য়ুআনের অধীন, কিন্তু

সাধারণ নাগরিক সমিতি বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড এবং জিলা গভর্নমেণ্ট-গুলি প্রাদেশিক শাসনমণ্ডলের নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসন-মণ্ডলে একজন চেয়ারম্যান এবং জনকয়েক কর্মচারী বা অফিসার আছে। প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের কার্যবিভাগে আছে কার্যাধ্যক্ষের সেরেস্তা অথবা সেক্রেটারিয়েট, সামাজিক ব্যবস্থা বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, শিক্ষা সংসদ, পুনর্গঠন সমিতি এবং শান্তিসংরক্ষণ সভা। প্রত্যেকটি বিশেষ মিউনি-সিপ্যালিটি এবং সাধারণ মিউনিসিপ্যালিটিতে আছে একজন মেয়র এবং তাঁর অধীনে কয়েকজন পরিচালক। জেলা গভর্নমেণ্টের নিয়ন্ত্রণভার ম্যাজিস্ট্রেটের উপর।

জাতীয় গভর্নমেণ্টের চেয়ারম্যান এবং যুআন-পঞ্চকের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস্‌প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করা হয় কুয়োমিংতাং-এর কেন্দ্রীয় কার্য-কারক পরিষদ্ থেকে। বর্তমানে চেয়ারম্যান হচ্ছেন লিন্‌শেন্[1]। কার্যকারক যুআনের প্রেসিডেণ্ট জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই-সেক[2]; ব্যবস্থাপক যুআনে সান্ ফো (ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের প্রথম স্ত্রীর সন্তান); বিচার যুআনে চু চেং; পরীক্ষক বা পরিদর্শক যুআনে তাই চি-তাও এবং নিয়ন্ত্রণ যুআনে য়ু য়ু-জেন। কার্যকারক যুআনের পরামর্শ অনুযায়ী জাতীয় গভর্নমেণ্ট থেকে মন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্মচারীদের নিযুক্ত করা হয়।

জাতীয় গভর্নমেণ্ট যে কুয়োমিংতাং দলের দ্বারা প্রভাবান্বিত একথা স্বীকার করা হয়েছে। কুয়োমিংতাং দলে ধর্মযাজকদের প্রাধান্য। দলের কেন্দ্রে হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং তার অধীনে বিবিধ

১. ১৯৪৩ সালে লিন্‌শেনের মৃত্যুর পর চিয়াং কাই-শেক চীন জাতীয় গভর্নমেণ্টের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি কার্যকারক যুআনের প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধান সেনাধ্যক্ষও আছেন ঐ সঙ্গেই।

২. ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে চিয়াং কাই-শেকের স্থানে ডাঃ এচ, এচ, কুং কার্যকারক যুআনের প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করেন।

প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিচে হচ্ছে বিভিন্ন জেলা সংগঠন; তার পরে স্থানীয় সংসদসমূহ, যেগুলি আবার বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত। এই দলের গঠনপ্রণালীর সাথে ভারতীয় কংগ্রেস দলের গঠনপ্রণালীর ঐক্য দেখা যায়। প্রবাসী চৈনিকদের সাথে সহযোগিতা রাখবার জন্য এই দলের একটি বিশেষ শাখা আছে।

যে-কোনো দলের চরম ক্ষমতা প্রকাশ পায় সভাতে। সাধারণ সভ্য এবং শাসন ও পরিদর্শনের বিশেষ সভ্যগণ এই সভাতেই নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় কার্যকারক পরিষদ কুয়োমিংতাং দলের চরম নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং কেন্দ্রীয় পরিদর্শন পরিষদ চরম পরিশোধনকারী। এই কেন্দ্রীয় কার্যকারক পরিষদ থেকে কার্যনির্বাহের জন্য কার্যকরী সংসদ নিয়োগ করা হয়। বিশুদ্ধ রাজনীতিক ব্যাপারগুলি দেখবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় রাজনীতিক সমিতি আছে। কার্যকরী সংসদের (Standing committeeর) চেয়ারম্যান হচ্ছেন মার্শাল চিয়াং কাই-শেক, কার্যত যিনি এখন সমগ্র চীনের সামরিক বা বেসামরিক কর্তা।[১]

অধুনাতন রাষ্ট্রনীতিক নিয়মগুলি ডাঃ সানের ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত; যেমন, দেশের আধিপত্য, স্বাধীনতা, এবং রাষ্ট্রিক অখণ্ডতা স্থাপন, বিদেশী প্রভুত্ব বা আক্রমণের প্রতিরোধ এবং মাঞ্চু রাজসরকার কৃত অন্যায় ও অসম সন্ধিসর্তগুলির উচ্ছেদ। সম্প্রতি এইসব সর্ত রহিত এবং পণ্যশুল্ক স্বায়ত্তাধীন হয়েছে।

১. কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রিক সংসদের চেয়ারম্যান ছিলেন ওয়াং চিং-উয়েই। ইনি ছিলেন খ্যাতিমান কবি; ডাঃ সানের জীবিতকালে যেসব প্রয়োজনীয় রাজনীতিক বিবৃতি বেরিয়েছে তার প্রায় সবই এই সুযোগ্য লেখকের কৃতিত্ব। ওয়াং ছিলেন ডাঃ সানের বিশ্বস্ত এবং যোগ্য প্রতিনিধি। কিন্তু জাপানীরা চীন আক্রমণ করবার পর রাজনীতিক-বিরোধ বশত ইনি শত্রুর সহযোগিতা করেন, জাপান অধিকৃত চীনে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হিসেবে তিনি কাটাচ্ছিলেন; সম্প্রতি ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে তিনি মারা গেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

চীনের অর্থনৈতিক বিকাশ

কৃষি

সভ্যতার আদিমতম যুগ থেকেই চীনকে কৃষিপ্রধান দেশরূপে দেখা যায়। দশহাজার বছরেরও আগে সম্রাট শেন মুং চীনাদের ভূমিকর্ষণ শিখিয়েছিলেন। প্রায় ৪,৬০০ বছর আগে পীতসম্রাট রেশম-উৎপাদন শিল্প গড়ে তোলেন।

পুরাকালে কৃষিই দেশবাসীদের একমাত্র উপজীবিকা ছিল। এটা একরকম আইনের মতোই ছিল যে পুরুষ চাষ করবে আর নারী বয়নের কাজ করবে। চীনে একটি প্রবাদ আছে: "যদি একটিমাত্র লোকও চাষ না করে তবে কেউ না কেউ ক্ষুধায় কষ্ট পাবে; যদি একটিমাত্র নারীও কাপড় না বোনে তবে কেউ না কেউ শীতে কষ্ট পাবে।" এ-ছাড়া আর সবরকম কাজকেই অপ্রধান বলে গণ্য করা হত। এমনকি শী তাই ফু অথবা রাজকর্মচারীরাও অবসর গ্রহণের পর চাষের কাজে লেগে যেতেন। প্রাচীন চীনাসাহিত্য থেকে এবিষয়ে বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা সংগ্রহ করা যায় এবং বোঝা যায় জমির কাজকে তারা কত উঁচু আসন দিত। মহামুনি মেনশিয়ুস লিখে গেছেন "বসন্তকালে রাজা চাষের কাজ পরিদর্শন করে ঘাটতি শস্যের বীজ দান করতেন; শরৎকালে ধান্যোৎপাদন পরিদর্শন করে তিনি ঘাটতি শস্যের মূল্য দিতেন।" দেশপ্রেমিক 'কুয়ান ৎস্থ' বলেছেন "কৃষি জাতীয় সম্পদের প্রধান কেন্দ্র, এইজন্য বিগত যুগের রাজারা কৃষকদের শ্রদ্ধা করতেন।" তিনি এমনকি বিদ্যাপ্রসারেরও বিরোধী ছিলেন,

পাছে পণ্ডিত হয়ে গেলে লোকে কৃষিকর্ষণে বিমুখ হয় এবং পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

রাজতন্ত্রের আমলে প্রতি বসন্তে হলকর্ষণ উৎসব হত; রাজা নিজে প্রজাদের সামনে হলচালনা করতেন। এই উৎসব পেইপিং-এর কৃষিমন্দিরে অনুষ্ঠিত হত, যাকে চীনে 'শিয়েন নুং তান্' বলা হয়। ইদানীং চীনে খুব বেশি পরিবর্তন হয়েছে এবং কৃষিশিল্পের অবনতি দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এখনও কৃষিই জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন এবং বারো আনি লোকই কৃষিব্যবসায়ী।

ভূস্বামিত্ব কৃষির প্রধান সমস্যা। বর্বর যুগে ভূমি ছিল সকলের; এমনকি সামাজিক ব্যবস্থার প্রারম্ভে যখন লোকে চাষের কাজেই মন দিল তখনও জমি কারো একলার সম্পত্তি ছিল না। 'চউ সুং' এ আমরা পাই ('বুক অফ পোয়েট্রি'র অংশবিশেষ):

গম আর বীজ দিয়েছেন ভগবান
আর আমরা সকলে তা ছড়িয়ে দিই
সমগ্র জমিতে।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে জমি ছিল সর্বসাধারণের। ক্রমে এই দলগুলি এক প্রচণ্ড জাতিতে গড়ে উঠল, ভূমি অধিকারের নতুন ধারা প্রবর্তিত হল, কিন্তু জমি তখনও জাতীয় সম্পদই রইল। 'বুক অফ পোয়েট্রি' থেকে আবার কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক্:

সমগ্র পৃথিবীটাই হল রাজার জমি
আর যত লোক সব সেই রাজার প্রজা।

এখানে রাজা বলতে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে বোঝায় না; এ হচ্ছে রাজশক্তি, রাজতন্ত্র বা এক কথায় জাতি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে জমি জাতীয় সম্পদ বলেই পরিগণিত হত। সরকার থেকে প্রজাদের জমি ভাগ করে দিয়ে তাদের থেকে কিছু কর নেওয়া হত; জমি ভোগ

করত প্রজারাই। এই জমিপ্রথাই 'চিয়েন তিয়েন' পদ্ধতিতে প্রবর্তিত হয়েছিল, সে কথা প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। কিন্তু রাজাই যখন জাতির প্রতিনিধি তখন রাজা এবং জাতির প্রকৃত অর্থ বা সংজ্ঞা কী এই নিয়ে গোলমাল শুরু হল। ক্রমে রাজা মনে করতে লাগলেন যে জমি তার নিজের, আর সেই ক্ষমতায় তার প্রিয় প্রতিনিধিদের ভিতর জমি ভাগ করে দিতে লাগলেন; তারা আবার তাদের ভাগ-বণ্টন করে দিল আত্মীয় পরিজনদের। এইভাবে সাধারণের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল রাজার খাসতালুক। ক্রমে ক্রমে জমি নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়ে গেল, রীতিমতো কেনাবেচা চলতে লাগল। চীনে জমির স্বত্বের কতকগুলো বিশেষত্ব আছে। প্রথমত যদিও কারো কারো নিজস্ব জমি আছে, কিছুটা জমি কিন্তু তবুও সাধারণের দখলে। দ্বিতীয়ত, যদিও জমির ক্রয়বিক্রয় চলে, তা কখনোই কয়েকটি ব্যক্তির ভিতর সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ এখানে জমিদারী প্রথা নেই। এই নিয়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে ৫০ থেকে ১০০ মাও জমি যাদের আছে সংখ্যায় তারা মোটে শতকরা নয় জন; আর মাত্র শতকরা ৫ জনের ১০০ মাও এরও বেশি জমি; অধিকাংশ লোকেরই মাত্র দশ-বিশ মাও জমি। আর একেবারে জমি নেই এমন লোকের সংখ্যা যৎসামান্য। সুতরাং অন্যান্য দেশের মতো ভূমিসমস্যা চীনে নেই। সম্প্রতি জাতীয় গভর্নমেণ্ট ডাঃ সানের পরিকল্পিত ভূমিপদ্ধতি অনুযায়ী চীনে প্রকৃত সাম্যবাদী ভূম্যধিকার প্রবর্তনের চেষ্টা করছে।

চীন আয়তনে বিশাল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ তার প্রচুর; বরাবরই কৃষিপ্রধান দেশ বলে কৃষিজ সম্পদই চীনের জাতীয় সম্পদের গোড়ার জিনিস। ধান, গম, বার্লি, নীবার, সয়াবিন প্রভৃতি অনেক রকম শস্য এবং তরিতরকারি শন, পাট, চা, আখ ইত্যাদি হচ্ছে চীনের প্রধান উৎপাদন।

পশুও চীনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সঠিক সংখ্যা এযাবত নির্ধারিত না হলেও সকলেই জানেন যে গৃহপালিত পশুই চীনের জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান উপাদান। বনজঙ্গলগুলো পশমি পশুতে ভর্তি, তাদের থেকে প্রচুর পশম সংগৃহীত হয় আর পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে রপ্তানি হয়। তিনটি প্রধান বনবিভাগ আছে: পূর্ব প্রদেশত্রয়, ফুকিয়েন প্রদেশ এবং হোনান প্রদেশ। এর ভিতর পূর্ব প্রদেশগুলির জঙ্গলই আয়তনে সবচেয়ে বড়ো আর এদের উৎপাদনও সবচেয়ে বেশি। ফুকিয়েনের জঙ্গলে কর্পূর গাছ প্রচুর আছে, বাণিজ্য ব্যাপারে যার প্রভূত মূল্য। চীনে সমুদ্র এবং নদনদী থেকে মাছ পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের কেন্দ্রটি ২৮৩,৫০০ সামুদ্রিক বর্গমাইল; এবং এর বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ প্রায় ১৫৩,৪৭২,৮০০ ডলার।

খনিজ সম্পদের জন্যও চীন পরমুখাপেক্ষী নয়; শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজন মতো প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান খনিজগুলিই পাওয়া যায়। এর ভেতর নাম করা যেতে পারে, কয়লা, লোহা, তামা, মাংগানিজ, টাংস্টেন, এ্যান্‌টিমনি, সোনা, রূপা, পেট্রোলিয়ম এবং পারদ। স্বনামধন্য ভূতত্ত্ববিদ্ ডব্লিউ, এইচ, উয়োং এর গবেষণা অনুযায়ী চীনে নাকি কয়লা আছে ২৫০,০০০,০০০,০০০ টন, অর্থাৎ যে অনুপাতে কয়লা এখন তোলা হচ্ছে এভাবে আরো ১০,০০০ বছর তোলা চলবে। ধাতব লোহা আছে ১, ১৩২,৮০১,৫৭০ টন, কিন্তু প্রায় সবটাই মাঞ্চুরিয়ায়, এবং যদি পরিণামে উক্ত প্রদেশটি বেদখলই থেকে যায় তবে চীনের নিজস্ব লৌহসম্পদ একেবারেই থাকবে না বললেও হয়। টাংস্টেনের মতো দুর্লভ ধাতুও অধিকাংশই চীনে পাওয়া যায়। ১৯৩৩ সালে সমগ্র পৃথিবীর টাংস্টেন উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৪,০০০ টন, তার ভিতর অন্তত ৬,০০০ টনই পাওয়া গেছে চীন থেকে। এ্যান্‌টিমনি উৎপাদনেও চীন পৃথিবীর

নেতৃস্থানীয়। যদি খনিজ সম্পদ ঠিকমতো উৎপাদন করতে পারা যায় তবে চীন পৃথিবীর ধনী দেশগুলির ভিতর অন্যতম হয়ে দাঁড়াবে।

যদিও চীন কৃষিপ্রধান, তবু রেশম এবং পোর্সিলেন (চিনেমাটি) শিল্পে বহুকাল থেকে এদেশ অগ্রগণ্য হয়ে আসছে। রোমীয় সাম্রাজ্যের আমলেই য়ুরোপ চীনের রেশম শিল্পের সাথে পরিচিত হয়, খ্রীস্টপূর্ব ২০০ সাল থেকে বহু শতাব্দী ধরে চীন থেকে য়ুরোপে রেশম রপ্তানি হয়েছিল। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ খ্রীস্টীয় শতাব্দে য়ুরোপের ফ্যাশান-জগতে চীনা সিল্কের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি। পোর্সিলেন শিল্পের জন্যও চীন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে; মিং রাজাদের সময়ে (১৩৬৮-১৬৪৪ অব্দ) এই শিল্পের চরমতম উন্নতিসাধন হয়েছিল। "এই সময়ে য়ুরোপের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যের যোগ হয় এবং পোর্সিলেনের মতো ভারি এবং ভঙ্গুর সামগ্রীর রপ্তানিও সম্ভব হয়।"

আত্মপোষণ ক্ষমতা ও রক্ষণশীলতা

গোড়াথেকেই চীন অর্থনৈতিক ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল। নিছক অলস গর্বভরেই সম্রাট চিয়েন লুং রাজপ্রতিনিধি ম্যাকার্টনিকে বলেননি যে এই ঐশ্বরিক সাম্রাজ্যে সব জিনিসই এত প্রচুর এবং প্রভূত পরিমাণে আছে যে তার জন্য বৈদেশিক বর্বরদের কাছে হাত পাততে হবে না। তিনি জানতেন যে 'বৈদেশিক বর্বরেরা' তাঁর কাছে সাহায্য চাইবেই, বিশেষত চা, পোর্সিলেন, ও রেশমি দ্রব্য উৎপাদনে; এবং সেই কারণে মাকাও বন্দর এই-সব দ্রব্য রপ্তানির জন্য খুলে দেওয়া হল। কিন্তু চীনে বিদেশী কোনো জিনিস আমদানি করবার প্রয়োজন প্রায় ছিলই না।

শুধু যে সমগ্র চীনই আত্মনির্ভরশীল ছিল তা নয় তার প্রতিটি

প্রদেশই প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি উৎপন্ন করত। উদাহরণ রূপে (আমার নিজ প্রদেশ) হুনানের কথাই ধরা যাক; তার উৎপন্ন দ্রব্য প্রয়োজন মিটিয়েও রপ্তানির জন্য বাড়তি থাকে। সুতরাং যুদ্ধপ্রিয় নেতৃবর্গ (Warlords) যখন অন্য প্রদেশ দখল করতে চাইত তার উদ্দেশ্য ছিল, এই সব দেশের ফসল হাতে পাওয়া, যাতে বেশ একটা বাড়তি আয় হাতে থাকে।

এমন কি গ্রামগুলিও আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করে। গ্রামের খাদ্য গ্রামেই জন্মায়, কাপড় প্রয়োজনমতো গ্রামেই তাঁতীরা বোনে আর অন্যান্য ছোটোখাটো দরকারি জিনিসও তারা নিজেরাই তৈরি করে নেয়। চীনের সাধারণ গ্রামবাসীর কাছে কলের তৈরি অলংকার ইত্যাদির কোনো মূল্যই নেই। গ্রামে প্রায়ই মেলা বসে আর সকলেই সেখানে জমায়েত হয়, আনন্দ করে, দরকারি জিনিসপত্র কেনে।

মেনশিয়ুস সে-যুগের গ্রাম্যজীবনের বর্ণনায় বলেছেন, "গ্রামবাসীরা কদাচিৎ গ্রাম ছেড়ে বাইরে গিয়ে বাস করেছে, গ্রামের বাইরে গেলেও নিজস্ব জেলার বাইরে কখনোই যাবার দরকার হয়নি। একই জমিতে যারা ভাগে চাষ করত তারা সবসময়েই পরস্পরের পোষকতা করেছে এবং একের বিপদে অন্যে সাহায্য আর রোগে শুশ্রূষা করেছে। এই ভাবে পরস্পরকে ভালোবেসে তারা একতাবদ্ধ হয়ে থাকতে শিখেছিল।"

লাও-ৎসে তাঁর সুন্দর ভাষায় গ্রাম্যজীবনের কথা বলে গেছেন; "খাদ্য দ্রব্যগুলি মধুর, জামা কাপড় সুন্দর; বাড়িগুলি নিরাপদ এবং জীবন আনন্দপূর্ণ। এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রাম দেখা যায়, কুকুরের চীৎকার আর মোরগের ডাক এ-গ্রামে ও-গ্রামে প্রতিধ্বনিত হয়, তবু গ্রাম ছেড়ে কেউ গ্রামান্তরে যাবার কথা কখনও ভাবে না।"

এসব অতিশয়োক্তি নয়; এখনো এমন লোক অনেক আছে যারা বাড়ি ছেড়ে পাঁচ মাইল দূরেও যাবার কথা ভাবে না। যাবার তাদের দরকারই পড়ে না; এক-একটি গ্রাম যেন ছোটোখাটো জগৎ।

(আমি আর একটু বাড়িয়ে এমন কথাও বলব যে) প্রত্যেকটি পরিবারও স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে থাকতে চেষ্টা করত। পুরুষ চাষের কাজ করত, নারী ঘরের কাজ করে অবসর সময়ে বুনত, সেলাই করত। শূকর, মোরগ আর গোরু প্রত্যেক পরিবারের বিশেষ সম্পত্তি ছিল; পুকুরে আর নদীতে মাছ ছিল প্রচুর। হাতে যখন অন্য কোনো কাজ থাকত না তখন তারা কুটিরশিল্পের দিকে মন দিত। জীবনের গতি সহজ ও নির্মল ছিল।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্বভাবতই দেশবাসীদের করে তুলেছিল রক্ষণশীল; কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সব সময়েই ছিল মহৎ। কনফুশিয়ুসের উপদেশ তারা কখনও ভোলেনি:

"প্রকৃতিদত্ত জিনিসগুলি সব সময়ে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে, শুধু নিজের জন্যে নয়, সর্বসাধারণের উপকারের জন্যে। দেহ মনকে সর্বদা কাজে লাগাতে হবে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নয়, সামাজিক মঙ্গলের জন্যে।"

লক্ষ্য হচ্ছে মনের নির্মলতা আর সন্তোষ, উদ্যমশীল এবং পরিমিত জীবন। চীনের আদর্শের সাথে ভারতের আদর্শের বিশেষ ঐক্য রয়েছে। আমার মনে হয় এই ঐক্য শুধুই বাহ্যিক নয়।

পশ্চিমের সহিত বাণিজ্য

চীনের যে বর্ণনা দেওয়া হল তা আধুনিক নয়; বিদেশী বাণিজ্য, বিশেষ করে পশ্চিমের সাথে বাণিজ্য আরম্ভ হবার সাথে সাথে এর পরিবর্তন হয়েছে। চীনের অর্থনীতিক জীবনের এই পরিবর্তন বুঝতে হলে তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ইতিহাস একটু জানা দরকার।

অহিফেন যুদ্ধ শেষ হবার পরেই প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যের সূচনা। মানুষের সাথে মানুষের সম্বন্ধের আর সভ্যতার এ এক বেদনাময় অধ্যায়। অহিফেন-যুদ্ধ চীনের কলঙ্ক নিঃসন্দেহ, কিন্তু পশ্চিমের পক্ষেও এটা কম লজ্জার কথা নয়। সংক্ষেপে ঘটনাটা নিচে বলা যাক।

পর্তুগীজ বণিকেরা সর্বপ্রথম চীনে আফিং আমদানি করে। তার পরিমাণ ছিল খুব সামান্য কেবলমাত্র ওষুধের জন্যই তার ব্যবহার। ১৭২৯ খ্রীস্টাব্দে এক রাজাজ্ঞা অনুযায়ী আফিং-এর বাৎসরিক আমদানির পরিমাণ ২০০ পেটিকায় নির্ধারিত ছিল। ১৭৭৩ অব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আফিং ব্যবসায়ের এক বিশেষ সনন্দ সংগ্রহ করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় জাত আফিং প্রভূত পরিমাণে চীনের দক্ষিণস্থ প্রদেশ ক্যানটনে রপ্তানি করতে লাগল। এবং তাদের কৃতিত্বে ১৭৮৯ সালে এই রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াল গিয়ে ৪০৫৪ পেটিকায়; চীনের সমস্ত বাজার প্লাবিত করে চলল আফিং-এর ব্যবসা। তার পর ক্রমশ এর পরিমাণ বাড়তে বাড়তে ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৯ অব্দের ভিতর এই সংখ্যা দাঁড়াল ৩০,০০০ পেটিকায়। চীনাদের রক্ত-জল-করা অর্থের প্রায় ১,০০,০০০তায়েল এমনি করে প্রতি বছর শুধু এই বিশ্রী জিনিসের জন্য বিদেশে চলে যেতে লাগল। কিন্তু এর থেকেও খারাপ হল সমগ্র চীনের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য এবং নৈতিক চরিত্রের উপর এর ভয়াবহ কুফল। এযাবত যত রকম পাপ আর কষ্ট চীনারা ভোগ করেছে তার

ভিতর সবচেয়ে হীন আর নিষ্ঠুর হল এই আফিংএর মার; সমাজ আর সভ্যতার ভিত নেড়ে দিল এই মর্মন্তুদ অভ্যাস।

গভর্নমেন্টের কিন্তু সজাগ দৃষ্টি ছিল এদিকে, এবং অনেকবার এটা বন্ধ করবার চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। ১৮৩৮ সালে এই কাজের জন্য লিনৎসে হ্সু নামে একজন সুদক্ষ কর্মচারী নিযুক্ত করা হল। লিন প্রাণপণ চেষ্টা করে বিদেশী বণিক আর জাহাজের কর্তাদের এই মাদক দ্রব্যের আমদানি বন্ধ করবার চুক্তি করিয়ে নিলেন। তাদের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হল যে যাবতীয় জাহাজ আর নৌকো চীনা কর্তৃপক্ষ তল্লাসী করে দেখবেন আর যদি কোনো আফিং পাওয়া যায় তবে সেই পোতযান বাজেয়াপ্ত করে আইন ভঙ্গকারীদের ফাঁসি দেওয়া হবে। এর পরে ক্যান্টনে ব্রিটিশ বণিকদের থেকে ২০, ২৯১ বাক্স আফিং সংগ্রহ করে সর্বসাধারণের সমক্ষে তা পুড়িয়ে ফেলা হল। এইটি হল অহিফেন যুদ্ধের প্রধান কারণ, এবং ১৮৪০ অব্দে আরম্ভ হয়ে তিন বছর পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলল।

প্রথম দিকে ব্রিটিশের অবস্থা সুবিধাজনক যাচ্ছিল না; ক্যানটন দুর্গ সুরক্ষিত থাকায় তারা কেবল উত্তরাঞ্চলেই আঘাতের চেষ্টা করছিল। কিন্তু মাঞ্চু গভর্নমেন্টের অবস্থা শোচনীয় হয়েই ছিল, সুতরাং বেশি দিন শত্রুপক্ষকে আটকে রাখা গেল না। নানকিং চুক্তিতে চীনকে অহিফেন বাণিজ্যের ক্ষতিমূল্য ৯০,০০,০০০ ডলার, সামরিক ক্ষতিপূরণ ১,২০,০০,০০০ ডলার দিতে হল, হংকং সমর্পণ করতে হল এবং 'চুক্তিবন্দর' হিসেবে কতকগুলো বন্দর বাণিজ্যের জন্য খুলে রাখতে হল। আফিংএর বাণিজ্য বন্ধ করা বা কমানো দূরের কথা, আফিং-এর নামই এই চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হল না।

জাতীয় গভর্নমেন্ট স্থাপনের পর আফিং তাড়াবার জন্য একরকম

যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এপাপ এখনও একেবারে দূর হয়নি। চীনের পক্ষে এটা লজ্জার বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু বিদেশীয়দের পক্ষেও এ সমানই লজ্জার কথা।

অহিফেন যুদ্ধের আগে বিদেশী বাণিজ্য কোয়াংটো এবং ম্যাকাও-এ সীমাবদ্ধ ছিল। আফিং ছাড়া ঘড়ি এবং ঐ জাতীয় কিছু জিনিসও আমদানি হত; আর রপ্তানি হত প্রধানত রেশম, চা, পোর্সিলেন দ্রব্যাদি এবং ওষুধপত্র। অহিফেন যুদ্ধ শেষ হবার পর ইয়োরোপীয় জাতিগুলি একের পর এক চীনে ব্যবসা করতে আসতে লাগল আর দুর্বল মাঞ্চুরাজ তাদের জন্য বাধ্য হয়ে একটার পর একটা বন্দর উন্মুক্ত করে দিতে লাগলেন। ১৯১১ সালে মাঞ্চুরাজত্ব যখন শেষ হল ততদিনে এই চুক্তিবন্দরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় একশ। শস্তা কলের তৈরি জিনিসপত্র এসে কুটিরশিল্পকে প্রায় লুপ্ত করে দিতে লাগল। এইখানে চীনের সঙ্গে ভারতের অবস্থার তুলনা করা যেতে পারে। এদেশে ইয়োরোপীয় বণিকদের শোষণের ইতিহাস হিন্দুস্থানের থেকে একটুও তফাত যায় না। আমাদের এই দুটি দেশ যেন দুটি বিপন্ন বোনের মতো।

১৮৬৪ সালে চীনে বৈদেশিক আমদানির মূল্য ছিল ৫,১২,৯৩,৫৭৮ হাইকোয়ান-তায়েল, ১৯৩১ এ গিয়ে দাঁড়াল ১,৪৩,৩৪,৮৯,১৯৪ তায়েলে। আর ঐ দুই বছরের রপ্তানির মূল্য যথাক্রমে ৫,৪০,০৬,৫০৯ তায়েল এবং ৯০,৯৪,৭৫,৫২৫ তায়েল। একে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে না, এ হচ্ছে বাগে পেয়ে এক জাতি অপর জাতির গলা টিপে ধরা। চীনে প্রচুর অর্থ বিদেশীরা খাটাচ্ছে, বেশির ভাগ খনিরই পরিচালক বিদেশীরা; এমন কি অনেকদিন ধরে চীনের মুদ্রানিয়ন্ত্রণও ছিল বিদেশীর হাতে।

পুরাতন প্রথায় ভাঙন

বিদেশী বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে ; পরপর সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

১. চুক্তিবন্দরগুলিতে বহু অর্থ খাটানো হওয়াতে আর গ্রামের অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হয়ে পড়াতে ঐ বন্দরগুলির সামাজিক ও রাজনীতিক গুরুত্ব খুব বেড়ে যায়। পূর্বে চীনা শহরগুলির বিশেষ কোনো বাণিজ্যগত প্রতিপত্তি ছিল না ; তাদের খ্যাতি ছিল বিদ্যা এবং সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে। আজ যে সাংহাই নিয়ে এত বকাবকি হয়ে গেল ও যাচ্ছে, কিঞ্চিন্ন্যূন একশ বছর আগে এটা ছিল নেহাতই ছোটো একটা গ্রাম। নানকিং সন্ধিশর্ত অনুযায়ী চুক্তিবন্দরের অন্তর্গত হবার পরই বাড়তে বাড়তে সাংহাই এখন ৩০,০০,০০০ বাসিন্দা নিয়ে শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্র আর পোতাশ্রয় হয়ে উঠেছে। এখানে বিদেশীদের বিশেষ সুবিধার (foreign concession) সবিশেষ ব্যবস্থা, বেশ কয়েকজন বিদেশী *প্রতিনিধি নিয়ে বিদেশীয়দের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। সাংহাই-এর* মারফতেই বিদেশীরা চীনের উপর তাদের অর্থনীতিক প্রভাব বজায় রেখেছে। এইটিই যে এধরনের একমাত্র বন্দর তা নয়, এরকম ব্যবস্থা আরো অনেক আছে।

গ্রামগুলি তাদের বিশেষত্ব হারিয়েছে এবং এই সব অঞ্চল থেকে লোকেরা ক্রমাগত শহরগুলিতে গিয়ে বসবাস শুরু করেছে। তবুও চীন কৃষিপ্রধান দেশই রয়েছে এখনও। কিন্তু গ্রামগুলিকে এভাবে হারানো মানে চীনের সমগ্র জাতির ক্ষতি ; শহরগুলির উপর বিদেশী প্রভাব এত বেশি যে তা যেন বাস্তব চীনের বাইরে।

২. দ্বিতীয়ত মহাজনী কারবার (capitalism) এবং নির্ধারিত

দায়িত্বের (limited liability) প্রতিষ্ঠানগুলির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কথাও বিবেচনা করে দেখা দরকার; এদুটো জিনিসই বৈদেশিকদের আমদানি। যে কোনো দেশে যে কোনো সমাজে সব সময়েই এক জনের সাথে অপরের, এক পরিবারের সাথে অন্য পরিবারের, এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর আর্থিক তারতম্য থাকবেই। চীনসভ্যতার স্বর্ণযুগেও এই প্রভেদ ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য ধনিক সম্প্রদায়ের মতো শ্রেণীভেদ কোনোদিনই ছিল না।

চীনের বাণিজ্য সবসময়েই চুটকি ব্যবসাদারদের হাতে থাকত; সম্পত্তির একত্রীকরণ অথবা ভাগাভাগি দায়িত্বে সমাজের শোষণ কোনোদিনও দেখা যায়নি। প্রত্যেক চাষীকেই একরকম ব্যবসাদার বলা চলত। বণিকরা যারা উৎপাদক এবং গ্রাহকদের মধ্যবর্তিতা করত তাদের যেন উৎপাত বলেই বিবেচনা করা হত। তারপর ক্রমে বিদেশীরা এল তাদের মূলধন নিয়ে, তাদের কারখানা আর নূতন ধরনের ব্যবসাপ্রণালী নিয়ে; চুটকি ব্যবসাদারেরা কোথায় তলিয়ে গেল। চীনারাও বৈদেশিক ব্যবসাপ্রণালীর শিক্ষা নিল, কারখানা বসাতে শিখল আর নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ধনিকবৃত্তির দীক্ষা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলতে লাগল।

৩. মহাজনী প্রথা অবলম্বনের সাথে সাথে চীনে যন্ত্রযুগ আরম্ভ হল। আগেই বলা হয়েছে চীনে প্রভূত শিল্পগত উন্নতি ছিল, কিন্তু তা প্রধানত কুটির শিল্প; বৃহৎ বৃহৎ কারখানাও ছিল না যন্ত্রও ছিল না। সুতরাং এই বিবর্তনের জন্যও বিদেশী ব্যবসাদারেরাই দায়ী।

প্রথম প্রথম তারা নিজ নিজ দেশ থেকে শিল্পসম্ভার নিয়ে আসত, কিন্তু ক্রমশ কারখানা স্থাপন করে এদেশেই জিনিসপত্র তৈরি করতে আরম্ভ করে দিল। কাঁচামালও শস্তা আর মজুরিও খুব কম, কাজে

কাজেই চীনের বাজারে এই ব্যবসা খুব লাভের হয়ে দাঁড়াল। তারা মূলধন ঢালত আর পরিচালকের কাজ করত, বাকি সবই তাদের তাঁবে থেকে করত চীনারা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্লার্ক য়ুনিভার্সিটির প্রফেসর জি, এচ, ব্লেকসলির মতে চীনে বিদেশীদের খাটানো মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৪০০,০০,০০,০০০ ডলার; অর্থাৎ প্রত্যেক চাষীপিছু দশ ডলার।

ক্রমে চীনারা বিদেশী শোষকদের ফন্দিগুলো আয়ত্ত করে ফেলে নিজেরাই কারখানা গড়ে তুলতে লাগল; কিছুকাল পূর্বের এক গণনায় দেখা গেছে সবরকমের শিল্প জড়িয়ে অন্তত ১,৭৯৫ টি বড়ো কারখানা আছে।

৪. সবশেষে দেখা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলস্বরূপ চীনে প্রচুর বিদেশী ব্যাঙ্ক হয়ে গেছে আর টাকার বাজার সম্পূর্ণরূপে এদের প্রভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। বাড়তি টাকা জমা রাখবার জন্ম ছোটোছোটো ব্যাঙ্কের প্রথা এখানে বহুকাল থেকেই চালু ছিল, কিন্তু সেগুলো নিতান্তই স্থানীয় কারবার এবং তাদের বাজারে বিশেষ কোনো প্রতিপত্তি ছিল না। বিদেশী শিল্পের সাথে সাথে প্রচুর বিদেশী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়ে শীঘ্র কাগজের নোট ছাপাবার অধিকার পেল আর জাতীয় টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ শুরু করে দিল। চীনারাও শীঘ্রই এই উপায় অবলম্বন করে বহু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে ফেলল। কিছুকাল আগের গণনার ফলে দেখা যায় চীনে ১০৬টি দেশী ব্যাঙ্ক এবং ২৪টি বিদেশী ব্যাঙ্ক নিয়মমতো কাজ চালাচ্ছে। দেশী ব্যাঙ্কগুলো কিন্তু সম্পত্তি আর তৎপরতার দিক থেকে বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির থেকে হীন।

মাঞ্চুশাসনের শেষদিকে ঢাকুরেরা তাদের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার ভয়ে বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা রাখতে থাকে। বিগত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এই ব্যাঙ্কগুলি দেউলে হয়ে যাওয়াতে তাদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রণলিপ্সু নেতা (warlods) বা অন্যান্য যারা অসংগত উপায়ে অর্থসংগ্রহ করেছে তারা সকলে আবার তাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে রক্ষা করবার জন্য বিদেশী ব্যাঙ্কেই জমা দিতে থাকে। ১৯২৫ সালে এই সব ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ ছিল ৪৯৪,৭৪,০৬,৮১৭ ডলার। চীনের জাতীয় জীবনে এই সব ব্যাঙ্ক যেন দুষ্ট গ্রহের মতো হয়ে রয়েছে। একদিকে যেমন তারা চড়া হারের বন্ধকী সুদে জাতীয় গভর্নমেন্টকে টাকা ধার দিতে থাকে, অন্য দিকে তেমনি রণলিপ্সু নেতা বা জাতীয়তার শত্রুস্থানীয়দেরও তারা টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে। চীনের গৃহবিপ্লবের দীর্ঘস্থায়িত্বের এও একটা কারণ।

এই সমস্ত বিবর্তনের ভিতর দিয়ে যে কোনো জাতির জীবনেই ঝড় বয়ে যায়, এবং চীনের মতো পুরানো দেশে এর ধাক্কাটা স্বভাবতই একটু বেশি করে লেগেছে ; মনে হয়েছে যেন অতীতের সঙ্গে এদেশ তার যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছে।

ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক প্রভাবসংকুল শহরগুলির কাছে গ্রামগুলির প্রয়োজনীয়তা যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ; কৃষিশিল্পই আর প্রধানতম উপজীবিকা রইল না, এবং পরিচিত গ্রাম্য শিল্পী বা ব্যবসাদারদের জায়গায় জুড়ে বসল বিত্তশালী ব্যবসায়ী, নূতন নূতন ব্যাঙ্ক আর যান্ত্রিক কারখানা। অতীতের ঐতিহ্যের লজ্জা ঢাকবার জন্য যেন তাড়াতাড়ি ভোল বদলাবার আপ্রাণ চেষ্টা চলতে লাগল।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নবতন প্রচেষ্টা

বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য জাতীয় জীবনের উপর যে প্রতিঘাত এনে দিয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি বা

সমাজের পুরাতন ভিত্তি প্রায় ভেঙে পড়ল; জীবনকে নূতন করে দেখতে গিয়ে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হল। গত কয়েক বছরের ভিতর যেন এক নূতন চীন গড়ে উঠেছে; এ-চীন আগের থেকে ভালো কিনা তার বিচার হবে কালের হাতে। কিন্তু নবতর জীবনের সমস্যা সমাধান নিয়ে সামাজিক নেতৃরা আর রাজমন্ত্রীরা বিব্রত হয়ে পড়লেন। দেশের বিরাটত্ব আর লোকসংখ্যার আধিক্য সমস্যা সমাধানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

চীনের জাতীয় গভর্নমেণ্টের কর্মীবৃন্দ বিশেষরূপে বাস্তবপন্থী; অর্থনৈতিক সমস্যার গুরুত্ব তাঁরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন। ডাঃ সান স্বয়ং ভূমিসমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে গেছেন; জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলিই তাঁর কর্মপদ্ধতির মধ্যে প্রধান।

১৯৩১ অব্দে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় অর্থনীতি সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের অর্থনীতিগত অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে এবং এই সংসদের কল্যাণে আরো অনেক উন্নতি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জাতীয় গভর্নমেণ্টের চেষ্টায় দেশের আর্থিক সংস্থানও সুষ্ঠু ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত এ দিকটায় নিয়ন্ত্রণের অভাব দেখা গিয়েছিল। হিসাবপত্র কিছুই প্রকাশ করা হত না এবং রাজকর্মচারীরাও নিজেদের আয় আর জাতির আয়কে বড়ো আলাদা করে দেখতেন না।

১৯৩০ সালে সর্বপ্রথম রাজস্বের আয়ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত হল এবং একজন রাজস্ব সচিব (Controller General of National finance) নিযুক্ত হলেন। সেই থেকে প্রতি বছর আয়ব্যয়ের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়ে আসছে। পূর্বে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের

ভিতর আর্থিক ক্ষমতার বিভেদ নির্দিষ্ট না থাকাতে প্রায়ই গোলমাল হত। কিন্তু এখন এর সুন্দর সমাধান হয়ে গেছে; কতকগুলো কর বা রাজস্ব স্থানীয় গভর্নমেণ্টকে আর কতকগুলি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টকে দিতে হয়।

এখন আর সেদিন নেই যখন নিয়মিতভাবে সাধারণকে বে-আইনি খাজনা দিতে হত যখন কোনো যুদ্ধনেতা (worlord) হয়তো কোনো প্রদেশ থেকে দশবিশ বছরের খাজনা অগ্রিম আদায় করে নিত। প্রধানতম প্রাদেশিক কর, কৃষিকর, ১৯৩০ সালে সাধারণের সুবিধামতো পরিবর্তিত করা হয়েছে। প্রথমত এই কর কখনও অগ্রিম নেওয়া যাবে না; দ্বিতীয়ত, নিয়মিত করের উপরে আর কোনো বিশেষ করভার চাপানো চলবে না; এবং তৃতীয়ত কৃষিকর বা অন্য কোনো বিশেষ কর সর্বসাকুল্যে জমির বাৎসরিক মূল্যের এক শতাংশের বেশি হতে পারবে না। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে জাতীয় আয় নিঃসংশয়রূপে বেড়ে গেছে। ১৯২৮ সালে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৬,০০,০০,০০০ ডলার; ১৯৩৩ সালে দাঁড়িয়েছে ৬৬,০০,০০,০০০ ডলার।

জাতীয় গভর্নমেণ্টের দ্বিতীয় কৃতিত্ব হচ্ছে আর্থিক সংস্কার (monitary reform)। পূর্বে চীনে দুরকমের মুদ্রার প্রচলন ছিল; রৌপ্য ডলার ছিল বিনিময়ের প্রধান মুদ্রা, আর রৌপ্য তায়েল ব্যবহৃত হত আদালতে আর ব্যাঙ্কে। এই দুই মুদ্রার পারস্পরিক মূল্যের অনুপাত (ratio) exchange) সময়ে সময়ে অত্যন্ত বেড়ে যেত বা কমে যেত। এই ব্যবস্থার ফলে শুধু যে অসুবিধা হচ্ছিল তাই নয়, ইহা সমাজের পক্ষেও অত্যন্ত অকল্যাণকর ছিল। এই অনিশ্চিত আর্থিক অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই খুব লোকসান হয়ে যেত।

গভর্নমেণ্ট প্রথমেই ব্যাঙ্কগুলির পুনর্গঠনে মনযোগ দিল। সেণ্ট্রাল

ব্যাঙ্কটি সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করা হল এবং তাতে তার মূলধনও খুব বেড়ে গেল। ব্যাঙ্ক অফ কম্যুনিকেশন্স এবং ব্যাঙ্ক অফ চীন এই দুটিরও পরিচালন ভার গভর্নমেন্ট নিয়ে তাদেরও অংশীদারি মূলধন বাড়িয়ে তুলল। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে আইনি বিনিময়ের (মুদ্রা) (legal tender) ভার দেওয়া হল; ব্যাঙ্ক অফ কম্যুনিকেশন্সের প্রধান কাজ হল শিল্প নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাঙ্ক অফ চীন হল আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক। তার পর মুদ্রাগুলির সংস্কারকল্পে পুরানো মুদ্রা প্রত্যাহার করে কেবলমাত্র এক শ্রেণীর ডলার চালু করা হল। রৌপ্যমানের অন্তর্গত একটি সুষ্ঠু মুদ্রানীতি এখন চীনে চলছে।

এরপরে গভর্নমেন্টের একটি বৃহৎ সাফল্য হচ্ছে যাতায়াতের সুব্যবস্থায়। চীনে রাস্তা প্রভৃতির বড়ো অসুবিধা ছিল। রেলপথ এবং জলপথ সবই শোষণপ্রিয় বিদেশীদের হাতেই থাকত। জাতীয় গভর্নমেন্ট স্থাপনের পরেই চীনের আভ্যন্তরীণ রেল নদী অথবা রাস্তায় চলাচলের সুবন্দোবস্তের চেষ্টা হতে লাগল। ১৯২১ সালে চীনের রাস্তাগুলির সর্বসাকুল্য দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ১,১৮৫ কিলোমিটার, ১৯৩১ সালের ভিতরেই সেটা হয়ে দাঁড়াল ৯৮,১৬১ কিলোমিটার এবং ১৯৩৬ সালে ১৫৮,৫০০ কিলোমিটার। এটা যে-কোনো গভর্নমেন্টের পক্ষেই কৃতিত্বের বিষয়। রেলপথেরও ক্রমশ বিস্তৃতি হচ্ছে, যদিও নানাকারণে রাস্তার মতো দ্রুত বর্ধমান নয়। জাহাজ ও এরোপ্লেনের ব্যবহারও বাড়ছে; জাপানের সঙ্গে ছোটোখাটো যুদ্ধবিগ্রহে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ্রামের উন্নতির ব্যাপারেও গভর্নমেন্ট খুব সচেষ্ট। কৃষিবিদ্যা-শিক্ষার জন্য বহু কলেজ স্থাপিত হয়েছে, এবং দেশের সর্বত্র প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলও করা হয়েছে যেখানে গ্রামোন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধিকাংশই অবৈতনিক।

সমবায় আন্দোলন দিয়েও অর্থনীতিক গঠনের সহায়তা হচ্ছে। ১৯২৪ সালে মাত্র ২৫টি সমবায় সমিতি নিয়ে যে কাজ আরম্ভ হয় অধুনা সেখানে অন্তত ২৬,২২৪টি সমিতি গড়ে উঠেছে।

কার্যত বিচার করে দেখা যায় যে ইতিমধ্যেই জাতীয় গভর্নমেণ্ট দেশের আশ্চর্য রকম উন্নতি করেছে। আমদানি ক্রমশ কমছে আর রপ্তানি বাড়ছে। যদিও আন্তর্জাতিক ব্যবসার হার খুবই বেশি তবুও ভরসা এই যে ক্রমশ তা কমে আসছে। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের ভিতর রপ্তানির থেকে আমদানির মূল্যের আধিক্য ছিল ২৮,৯৩,০৭,০০০ ডলার; ১৯৩৬ সালের ঐ একই সময়ে সেটা দাঁড়িয়েছে ১২,৭০,৬৯,০০০ ডলারে।

সুতরাং আশা হয়, যে-চীন তার শতসহস্র গ্রামের ভিতর দিয়েই বেঁচে আছে, চীন সরকারের এই গ্রামোন্নয়ন সংকল্পের পরিণামে তার পূর্বগৌরব আবার ফিরে আসবে।

চতুর্থ অধ্যায়

চীনের সামাজিক অগ্রগতি

সামাজিক গঠন

অতি প্রাচীনকাল থেকেই সান্-ৎস্থ, কোয়ান-ৎস্থ, হান্-স্থ, শাং-ৎস্থ প্রমুখ চীনা দার্শনিকবৃন্দ সামাজিক সমস্যা নিয়ে গবেষণা করে আসছেন। মানুষের গোষ্ঠীগত সম্বন্ধনির্ণয় ও সমাজবিজ্ঞান চীনের ইতিহাসে নূতন জিনিস নয়। সান্-ৎস্থ তাঁর একটি পুস্তকে লিখেছেন:

"জল আর আগুনের শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণ নেই; গাছ

আর ঘাসের প্রাণ থাকতে পারে, কিন্তু অনুভূতি (বা জ্ঞান) নেই ; পাখি আর পশুর অনুভূতি থাকতে পারে, কিন্তু ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা নেই ; কেবলমাত্র মানুষেরই আছে শক্তি, প্রাণ, অনুভূতি আর বিচারধর্ম। সুতরাং মানুষই হল সৃষ্টির পরিপূর্ণ রূপ। মানুষের শারীরিক শক্তির সাথে কোনো জন্তুর তুলনা করলে চলবে না ; ঘোড়ার মতো গতিবেগ মানুষের নেই সত্য। কিন্তু তবুও মানুষই পশুদের বশ করে কাজে লাগিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে তার কারণ মানুষ সংঘবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু পশুরা পারে না। কিন্তু মানুষ সংঘবদ্ধ হতে শিখল কেমন করে ? সহজাত কর্তব্যজ্ঞানই মানুষকে একতাবদ্ধ হতে শিখিয়েছে। আর ন্যায়নিষ্ঠাই কর্তব্যবুদ্ধির গোড়ার কথা। তাদের ন্যায়নিষ্ঠা আর কর্তব্যস্পৃহা আছে বলেই তারা মিলিত হতে পারে। আর মিলিত হয় বলেই তারা একতাবদ্ধ হয়। আর একতাবদ্ধ হয় বলেই সমষ্টিগতভাবে তাদের বলবৃদ্ধি পায়। আর বলবৃদ্ধি পায় বলেই তারা প্রভুত্ব করতে পারে।"

এখানে সান্-ৎসুর চিন্তাধারার গোড়াকার কথাটুকুই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং যদিও একে সমাজবিজ্ঞান নাম দেওয়া চলে না, তবুও তিনি এককথায় জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠতা এবং ক্ষমতার বিশ্লেষণ করেছেন।

চীনের সামাজিক গঠনের প্রধান বিভাগগুলি হচ্ছে :

(১) কৌলিক সংগঠন (Clan Organisation)

(২) রাষ্ট্রিক সংগঠন (Territorial Organisation)

(৩) কর্মিক সংগঠন (Professional Organisation)

একথা সকলেই জানেন যে চীনে পূর্বপুরুষদের পূজা করবার রীতি আছে ; এর ফলে পারিবারিক সংযোগ দৃঢ়তর হয়। সামাজিক সংগঠনের জন্য কৌলিক প্রথার প্রয়োজন। (ব্রিটিশ সমাজবিদ্ ডক্টর

রিভার্স বলেন, "কুল বা বংশ হচ্ছে জাতির বিবাহগত বিভাগ যার অংশীদারেরা পরস্পরের সঙ্গে কোনো সাধারণ সূত্রে আবদ্ধ; এই সূত্র পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস, কোনো বিশেষ সংস্কার বা কোনো সাধারণ দেশের অধিকার, যাই হোক না কেন, চীনে অদ্বিতীয় পূর্বপুরুষে বিশ্বাসই বংশপ্রথার ভিত্তি বলা যেতে পারে।)

প্রত্যেক কুল বা বংশ সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ, এবং এর আবার একটি সাধারণ কেন্দ্র থাকে, যাকে পৃথকভাবে প্রত্যেক বংশের নাম অনুযায়ী 'পারিবারিক মন্দির' বলা হয়। আবার প্রত্যেক বংশের ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখা আছে, তাদেরও বিভিন্ন 'শাখা মন্দির' বর্তমান। সাধারণত প্রধান মন্দিরটি জেলার প্রধান শহরে থাকে আর শাখামন্দিরগুলি দেখা যায় গ্রামে গ্রামে, যেখানে শাখা-বংশের বাস। বংশের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ হন প্রধান এবং মন্দিরের কাজের জন্য কয়েকজনকে নির্বাচিত করা হয়। বংশের প্রথম পুরুষের জন্মদিন উপলক্ষে বা অন্যান্য উৎসবের সময় পরিবারের সকলে সমবেত হয়ে অর্ঘ্যনিবেদন করে। এইখানেই কুলগত সমস্যাগুলির আলোচনা ও মীমাংসা হয়, এমনকি নিজেদের ভিতর দ্বন্দ্বেরও মিটমাট হয় এখানে। যখন এখানে মিটমাট একেবারেই সম্ভব হয় না তখন তারা আদালতের শরণ নেয়। প্রত্যেক বংশেরই পারিবারিক ইতিহাস বা কুলজি থাকে আর প্রত্যেকের জন্ম মৃত্যুর তারিখ এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা সব লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়।

প্রাদেশিক অথবা যাজক-সাম্প্রদায়িক প্রভাবের ফলে বহুবিধ স্থানীয় সম্প্রদায় চীনে দেখা যায়; জাতীয় জীবনেও এর প্রভাব সুস্পষ্ট। গ্রাম-অঞ্চলে কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন তু-তি মিয়াও অথবা স্থানীয় মন্দির, শেহ্-ৎসাঙ অথবা সামাজিক (যাজকাধীন) শস্যাগার, শু-য়ুআন অথবা স্থানীয় সাধারণ সমিতি। শহরে, বিশেষ করে শিল্প অঞ্চলে,

প্রধান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে হুয়েই-কোয়ান্, যার সাথে ইংলণ্ডের মধ্যযুগীয় ব্যবসা সমাজের (trade guild) তুলনা হতে পারে।

স্থানীয় মন্দির হচ্ছে সাধারণের উপাসনার স্থান। সামাজিক শস্তাগার উদ্‌বৃত্ত উৎপাদনের গোলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং দুর্ভিক্ষের সময় তার থেকে শস্য বিতরণ করা হয়। ভারতবর্ষেও নাকি এই ধরনের সাম্প্রদায়িক শস্তাগার ছিল। সাধারণ সমিতি গৃহে সামাজিক বা অন্তান্ত সভা বসে। (পঞ্চায়তের মতো) এখানে গণ্ডগোলের প্রাথমিক মীমাংসার চেষ্টা হয়; এবং মীমাংসা সম্ভব না হলে আদালতের শরণ নেওয়া হয়। প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতেও প্রতি জেলায় একটি করে সাধারণ গৃহ (district hall) আছে। তেমনি প্রধান রাজধানীতেও প্রত্যেক প্রদেশের জন্য ঐ রকম বন্দোবস্ত আছে (Provincial halls) যেখানে প্রতি জেলার প্রতিনিধিদের সভা হয়।

চীনের কর্মিক প্রতিষ্ঠানগুলি খুব পুরানো। কোনো একটি বিশেষ শিল্প সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী ও কর্মীদের নিয়ে একটি করে বিভাগ থাকে, যাকে বলে 'হাঙ' অর্থাৎ শ্রেণী। একই ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদের বলে 'তুং-হাঙ' অর্থাৎ সমশ্রেণীয়। সমগ্র দেশ জুড়ে বিভিন্ন শিল্পের অন্তত ৩৬০টি 'হাঙ' আছে। এগুলির প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র অর্থভাণ্ডার ও পরিচালকমণ্ডলী নিয়ে জেলার বা প্রদেশের প্রধান শহরে একটি করে কেন্দ্র আছে। বছরে দুবার, বসন্তে আর শরতে, এদের ব্যবসায়িক উন্নতির আলোচনা করবার জন্য অধিবেশন হয়। 'হাঙ'গুলির আবার একটি করে পরিচালক দেবতা আছেন, (গণেশের মতো), আর কোনো নির্দিষ্ট দিনে তাঁকে উদ্দেশ্য করে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

এই তিনরকমের সামাজিক দল ছাড়াও চীনে আছে (১) গুপ্ত সমিতি ও ভ্রাতৃসংঘ, (২) জনহিতৈষী সংঘ (Philanthropic

Societies) (৩) ধর্ম সংঘ। গুপ্তসমিতিগুলির মধ্যে বিখ্যাত কো-লাও-হুয়েই এবং ছিং-হুং-পেঙ; এগুলি ভবঘুরে আর পরিব্রাজকদের আড্ডার জায়গা। এই সব সমিতির বিরুদ্ধতা করা বোধ হয় উচিত নয়; এরা ইচ্ছে করলে সমাজের অনেক উপকার বা অপকার করতে পারে। সম্প্রতি এদের অনেকেই সংযুক্ত হয়েছে ডাকাতির দলের সাথে, কিন্তু কেউ কেউ আবার বিপ্লবীদলেরও সহায়তা করছে।

জনহিতৈষী সংঘগুলি অনাথাশ্রম, বিধবা সমিতি প্রভৃতি পরিচালনা করে; এরা পঙ্গু আর জরাগ্রস্তদের সাহায্য করে এবং নাবালিকাদের উদ্ধার ও রক্ষা করে থাকে। ধর্মসংঘ বা উপধর্মসংঘ চীনে অনেক আছে, এগুলি নিজেদের মতবাদ নিয়ে কাজ করে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে চীনে ধর্মগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে বর্তমান এবং সাম্প্রদায়িক কলহ সেখানে একেবারেই নেই।

চীনের সমাজ সংগঠনের ভিতর বর্ণপ্রথা একেবারে নেই। পূর্বে চীনারা চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; শিহ্‌ অথবা পণ্ডিত, নুং অথবা চাষী, কুং অথবা শ্রমিক আর শাং অথবা বণিক। সমাজের এই স্তরবিভাগে রাজসরকারেরও শুরহিসেবে ব্যবস্থার সুবিধে ছিল। কিন্তু একশ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীভুক্ত হওয়াটা সহজ ছিল, কারণ কেবলমাত্র জন্ম দিয়ে স্তরনির্ধারণ করা হত না, স্বকীয় প্রতিভা দিয়ে প্রত্যেকে যে-কোনো শ্রেণীর উপযুক্ত হয়ে উঠত। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্তদের ভিতর বিবাহে কোনো বাধা ছিল না এবং সেরকম বিবাহ প্রায়ই হত। পণ্ডিতদের সকলেই শ্রদ্ধা করত এবং সমাজে তাঁরাই সবচেয়ে উঁচুতে ছিলেন। বণিকেরাই সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর বলে বিবেচিত হত; তারা নিজেরা কোনো জিনিসই তৈরি করত না, এবং ধনী হলেও তারা সমাজের গলগ্রহ বলেই পরিগণিত হত।

চীনের পরিবার প্রথা এবং নারীর স্থান

চৈনিক সমাজে পরিবারপ্রথার প্রাধান্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। পারিবারিক সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রেম ও পবিত্রতা, ভ্রাতৃত্ব আর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে চীনাদের খুব নজর; তাই তারা সকলে একসঙ্গে বাস ক'রে এক একটা যৌথ পরিবার গড়ে তোলে।

চীনের আদর্শ পরিবার হচ্ছে পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, পুত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতির সম্মিলিত পরিবার। এইরকম পরিবারকে বলা হয় 'উ তাই তুং তাং', অর্থাৎ 'পাঁচপুরুষে একত্র বাস'। এই পরিবার রাজ-সরকারের প্রশংসা এবং সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করত। দশজনের পরিবার তো সাধারণ ব্যাপার, কোনো কোনো পরিবারের জনসংখ্যা একশো কি তারো বেশি হত। কয়েক বছর আগে চীনের সবগুলি কাগজে লি চিং-য়ুন নামে এক পণ্ডিতের ছবি বেরিয়েছিল। তিনি ১৬৬০ সালে জন্মেছিলেন, ২৫৮ বছর বেঁচেছিলেন, ১৪ বার বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর সন্তান ছিল ১৮০টি। গভর্নমেন্টের নথিপত্র থেকে জানা যায় যে এ ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। (আমি নিজে সাংহাই-এর এক পরিবারকে জানি যার লোকসংখ্যা প্রায় একশো; এরা সভা ক'রে পারিবারিক পুলিশ রেখে নিজেদের পত্রিকা দিয়ে যেন একটা আলাদা রাজ্য চালায়।) এইসব পরিবারে বয়স, স্ত্রী পুরুষ অথবা জীবিকার বিভিন্নতা নির্বিশেষে সকলের উপর সমান দায়িত্ব থাকে। পারিবারিক সম্পত্তি সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে সকলের জন্য থাকে, কিন্তু প্রত্যেকে আলাদা করে নিজস্ব সম্পত্তিও রাখতে পারে—দরকার হলে সেগুলোও সাধারণ সম্পত্তিভুক্ত করে নেওয়া হয়।

এই যৌথপরিবার-প্রথার বিশেষত্ব হচ্ছে পরস্পরের ভিতর ভালোবাসা

ও একতার বন্ধন। এর অবশ্য দোষও আছে, যেমন অল্প বয়স্কেরা অলস হয়ে পড়তে চায়; পৃথক্‌ভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ না থাকাতে অনেক সময়ে অশান্তির সৃষ্টি হয়। অধুনা পশ্চিমের সাথে যোগাযোগের ফলে পুরানো পরিবার-প্রথায় ভাঙন ধরেছে। বিদ্যার্জনের জন্য ইয়োরোপ বা আমেরিকায় গিয়ে অনেকেই বিদেশী স্ত্রী নিয়ে আসে, যারা পুরানো প্রথার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। যদি বিদেশী বণিকরা চীনের অর্থনৈতিক প্রথায় ভাঙন ধরিয়ে থাকে তবে তেমনি বিদেশী বধূরা ভেঙেছে পারিবারিক আধিপত্যকে।

এখন দেখা যাক সমাজে নারীর স্থান কোথায়। চৈনিক সমাজে যেমন পরিবারই প্রধান তেমনি প্রতি পরিবারে স্ত্রী হচ্ছে মধ্যমণি। প্রাচীন কাল থেকে চীনারা জেনে এসেছে যে পুরুষ কখনও গৃহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবে না; সেখানে নারীই প্রধান। প্রাচীনতম গ্রন্থ য়ি-চিং অথবা বিবর্তনবাদে বলা হয়েছে: 'নারীর স্থান অন্দরে আর পুরুষের কাজ বাইরে'। এবং লি-চিং অথবা ধর্মবিধিতেও বলা হয়েছে: 'পুরুষ আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলবে না আর নারী বহির্ব্যবস্থা সম্পর্কে মূক থাকবে'। সুতরাং স্ত্রীর আধিপত্যই সংসারে প্রবল এবং তার শক্তি পশ্চিমের আলোক প্রাপ্তাদের থেকেও বেশি। স্বামীকে সংযত রাখবার ভার স্ত্রীর; চীনদেশের স্বামীরা সকলেই এক হিসেবে স্ত্রৈণ। বাইরে যাদের সিংহতুল্য বিক্রম, বাড়ির চৌকাঠে পৌঁছেই তারা যেন ভেড়া ব'নে যায়। একটি বহুল প্রচলিত চীনা প্রবাদ আছে: 'শতসহস্র সৈন্য পরিচালনা করা বীরের পক্ষে সহজ হলেও কেবলমাত্র একটি স্ত্রীকে বশে রাখা প্রায় অসম্ভব'। কিছুদিন আগে প্রতিরোধ-বিরোধী দলের নেতা সেনানায়ক চাং শুয়ে-লিয়াং যখন সিয়ান-ফু প্রদেশে বিদ্রোহ করেন, তাঁর স্ত্রী তখন গিয়েছিলেন ইয়োরোপ

ভ্রমণে। বিদ্রোহের সংবাদ পাবামাত্র তিনি ফিরে এসে বললেন, "স্ত্রীর তাঁবে না থাকলেই পুরুষ একটা না একটা অনর্থ বাধাবেই।" এই থেকেই বোঝা যায় পরিবারে স্ত্রীর আধিপত্য কতটা।

কিন্তু এত ক্ষমতা থাকলেও সমাজে নারীর স্থান পুরুষের চেয়ে নিচে। পুরানো নজিরপত্র থেকে জানা যায় পুরাকালে চৈনিক সমাজে মাতারই ছিল প্রাধান্য। কিন্তু ক্রমশ তা একেবারে বদলে গেছে। মনীষী আর দার্শনিকেরা ক্রমশ বহু আইনকানুন প্রয়োগ করে নারীর ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছেন।

লি-চি অথবা 'সরকারী বিধি নির্দেশ' নামে প্রাচীন গ্রন্থ অনুযায়ী নারীর বাধ্যতা তিন প্রকার ('সান-ৎস্থং') আর তার গুণ চার প্রকার ('স্সু-তেহ্')। বন্ধন তিনটি হচ্ছে (১) বাল্যে পিতা, (২) যৌবনে স্বামী এবং (৩) প্রৌঢ়ে বা বৈধব্যে পুত্র। গুণ চতুষ্টয় হচ্ছে (১) সতীত্ব ও পবিত্রতা, (২) সংযত ও মিষ্টভাষণ, (৩) রমণীয়তা ও নম্রতা, এবং (৪) গৃহকর্মে নিপুণতা, যেমন রন্ধন, বয়ন, সীবন ইত্যাদি।

বালিকাবয়স থেকে শাসন ও শিক্ষার ফলে চীনের মেয়েরা স্বভাবত সুচরিতা এবং মার্জিতরুচি হয়। চৈনিক সমাজে আদর্শ নারী হবে 'লিয়াং-চি' এবং 'শিয়েন-মু', অর্থাৎ 'সুগৃহিণী এবং দয়ালু মা'।

যদিও চীনে পর্দাপ্রথা নেই এবং মেয়েদের ঘোমটার দরকার হয় না, তবুও সমাজে অবাধ মেলামেশার স্বাভাবিক অন্তরায় রয়েছে। আমরা এখনও স্ত্রীপুরুষে হাতে হাত দিয়ে রাস্তায় বেড়ানো বরদাস্ত করতে পারি না, আর পরস্পর জড়াজড়ি করে জাজ্ বাজনার তালে তালে মসৃণ মেজেতে নৃত্যও সহ্য করতে পারি না। যদিও পশ্চিমের অনুকরণে এ ধরনের দৃশ্য দেখা যায়, তবু সাধারণত এখনও এসব রুচিবিগর্হিত বলে বিবেচনা করা হয়।

গণতন্ত্র স্থাপনের পরে স্ত্রীপুরুষের আইনি অধিকার সমান হয়েছে, এবং জাতীয় গভর্নমেণ্ট নারীর অবস্থা উন্নত করবার জন্য যথেষ্ট উদ্‌যোগী হয়েছে, সহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবুও অধিকাংশ নারীই তাদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে যোগ দেয়। রাজনীতিক ক্ষেত্রেও মেয়েরা অগ্রণী হয়েছে, এবং মিছিলে বা সভায় তারা এখন রীতিমতো অংশ নেয়। সিভিল সার্ভিসেও মেয়েদের নেওয়া হচ্ছে এবং জাতীয় গভর্নমেণ্টে বহু স্ত্রীকর্মচারী দেখা যায়।

ধর্ম ও নীতি, উৎসব ও আচার

চীনের সমাজে ধর্মই প্রধান ভিত্তি। বলা যেতে পারে যে সম্পূর্ণ সামাজিক গঠনটাই ধর্মমূলক গঠন এবং সমগ্র সামাজিক সংযোগই ধর্মমূলক আত্মীয়তা। নিকট বা দূর সম্পর্কের মানুষের মধ্যে বয়সের তারতম্য অনুযায়ী একটা প্রভেদ, প্রাধান্য আর শৃঙ্খলার ধারা নির্দিষ্ট আছে। যেমন পরস্পর সম্বোধনের রীতি :—ভাই বোনদের ভিতর বড়ো জনকে বলা হয় 'শিউং' এবং 'ৎসু' ছোটোজনকে 'তি' এবং 'মেই'; জ্যাঠামশায়কে বলা হয় 'পো', কাকাকে 'শু'; পিসিমাকে বলা হয় 'কু', মামা এবং মাসিমাকে যথাক্রমে 'চিন্' এবং 'য়ি'; জ্যাঠিমা হচ্ছেন 'পো-মু', কাকিমা 'শু-মু', পিসেমশাই 'কু-ফু', মামিমা 'চিন্-মু', মেসোমশাই 'য়ি-ফু'; খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাই বোনদের যথাক্রমে বলা হয় 'থাং-শিউং-তি' এবং 'থাং-ৎসু-মেই' ইত্যাদি।

চৈনিক সমাজে এই ধর্ম বা নীতিগত সম্বন্ধের কতকগুলি বিভাগ আছে; 'সান-কাঙ' অথবা তিনটি বন্ধন', 'লু-চি' অথবা ছয়টি ক্রমবিভাগ, 'উ-লুন' অথবা 'পাঁচটি কুটুম্বিতা' এবং 'চিউ-ৎসু' অথবা নয়টি পুরুষ। বন্ধন তিনটি হচ্ছে (১) রাজা এবং প্রজা, (২) পিতামাতা এবং

সন্তানসন্ততি, (৩) স্বামী এবং স্ত্রী। এদের ভেতর ক্রমনির্দেশক সম্বন্ধ ছয়টি হচ্ছে (১) বাবা এবং তাঁর ভাই-এরা, (২) ভাই এবং বোনেরা (৩) বংশানুক্রম, (৪) মা এবং তাঁর ভাই-এরা, (৫) শিক্ষক এবং (৬) বন্ধুবৃন্দ। নয়টি পুরুষ হচ্ছে ঊর্ধ্বতন চারপুরুষ এবং অধস্তন চারপুরুষ নিয়ে। এছাড়া সাধারণ তিনটি সামাজিক আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছে (১) কোনো একটি পরিবার, (২) আত্মীয়স্বজন এবং (৩) বন্ধুবান্ধব।

চৈনিক সমাজ ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত ব'লে নৈতিকতা এর প্রধান উপাদান। যুগযুগ ধরে চীনের মনীষীরা নানারকম নিয়মকানুন দিয়ে নীতিবিজ্ঞানের প্রবর্তন করেছেন। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমে নাম করা যেতে পারে 'উ-চাং' অথবা পাঁচটি নীতিসূত্র; যথাক্রমে 'জেন'— উপচিকীর্ষা, 'য়ি'— ন্যায়পরতা, 'লি'— শিষ্টাচার, 'চিহ্'— জ্ঞান এবং 'শিন্'— সত্যপরায়ণতা। দ্বিতীয়ত 'স্যু-শিং' অর্থাৎ চাররকমের কর্তব্যপরায়ণতা এবং আচরণ; যথা 'শিয়াও' বাৎসল্যানুরাগ, 'তি'— ভ্রাতৃপ্রেম বা সৌভ্রাত্র, 'চুং'— বিশ্বস্ততা এবং 'শিন'— সত্যপরায়ণতা। তৃতীয়ত 'স্যু-উয়ে' অর্থাৎ জাতির চতুর্বিধ মেরুদণ্ড; যেমন 'লি'— শিষ্টাচার', 'য়ি'— ন্যায়পরতা, 'লিয়্'— চারিত্রিক সাধুতা এবং 'চিহ্'— লজ্জাশীলতা (আত্মসচেতনতা)। এ ছাড়াও বহুবিধ নৈতিকসূত্র আছে। কিছুকাল পূর্বে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন এই সমস্ত সূত্রগুলিকে একত্র করে একটা নূতন ধারা প্রবর্তন করেন, তাকে বলা হয় 'পা-তেহ্'— আটপ্রকার ধর্মনিষ্ঠা; (১) চুং—বিশ্বস্ততা, (২)শিয়াও— বাৎসল্যানুরাগ, (৩) জেন— উপচিকীর্ষা, (৪) আই— ভালোবাসা, (৫) শিন—সত্য-পরায়ণতা, (৬) য়ি— ন্যায়পরতা, (৭) হো— ঐক্য বিধান এবং (৮) পিন —শান্তি। এখন সমগ্র জাতির নৈতিকতার সূত্র হিসেবে এই আটটি মেনে চলা হয়।

চীনকে উৎসবের দেশ বলা হয়। সত্য, পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে যেখানে এত উৎসবাদি প্রচলিত। তথাকথিত 'তিনশ ক্রিয়াকাণ্ড এবং 'তিনহাজার আচারপদ্ধতি' অবশ্য লিপিবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এখানে বিবাহ এবং সৎকার প্রথা বা শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। বিবাহকে চীনে সবচেয়ে প্রধান অনুষ্ঠান ধরা হয় ব'লে এই উৎসবও অনেকদিন ধরে চলে। বিবাহ নির্ধারণ থেকে বিয়ে হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ছয়রকমের অনুষ্ঠান বা আচার মেনে চলা হয়; (১) 'না-ৎসাই— বিয়ের প্রস্তাব, (২) 'ওয়েন্-মিং'— কনের নাম শুধানো (বিয়ে স্থির না হওয়া পর্যন্ত কনের নাম জানবার নিয়ম ছিল না), (৩) 'না-চি'— বাংলায় যাকে বলে আশীর্বাদ, (৪) 'চিং-চি'— বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা, (৫) 'না-চিং'— কাপড় চোপড় গয়নাপত্তর ইত্যাদি যৌতুক দান, (৬) 'চিন-য়িং'— কনের বাড়িতে গিয়ে বর কনেকে নিয়ে আসবে। কনেকে বরের বাড়িতে বরণ করে নেবার সময়ে 'সম্রাটের আসন' অথবা ফুলের আসন নামে একটি সুন্দর আসনে করে গান বাজনা সহ চার বা আটজন লোক তাকে বয়ে নিয়ে আসে। বরের বাড়িতে পৌছনোর পর প্রথমেই স্বর্গ ও মর্তের বন্দনা করা হয়; দ্বিতীয় কাজ মৃত পূর্বপুরুষদের বন্দনা; তৃতীয়, বর কনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাবে।

এরপর একজোড়া লাল মোমবাতি জালিয়ে বর কনেকে সঙ্গে করে বিয়ের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে বাসর শয্যায় বসে সেই লালবাতি সামনে রেখে একই পাত্রে করে পরস্পর বিবাহের মদ্য পান করে। তারপর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলে মিলে অভিনন্দন জানাবার পর বরবধূকে নিয়ে হাসিঠাট্টা আমোদ প্রমোদ শুরু ক'রে সে বেচারাদের বিব্রত করে তোলে এই সময়েই বিয়েটা যেন ঠিক পাকাপাকি

হল বলে মনে হয়। পরদিন সকালে বরবধূকে উপস্থিত আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধব সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ে উপলক্ষে বরকনে উভয়পক্ষ থেকে একদিন বা দুদিন ধরে ভোজ দেবার নিয়ম আছে। বিয়ের পর এক মাস বধূ তার স্বামীর বাড়িতে অতিথির মতো যত্নে থাকে, সকলে তাকে নিমন্ত্রণ করে। এরপর সে তিনদিনের জন্য পিত্রালয়ে এসে বধূত্ব পরিহার করে নিজেকে পারিবারিক দায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করে নেয়। এতকাল ছেলেমেয়েদের বাবা-মা বা ঘটকেরাই বিবাহ স্থির করত, ছেলে বা মেয়ের ইচ্ছা বা মতামতের দরকার হত না, কিন্তু আজকাল বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক যুবতীরা পরস্পরের পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে করে থাকে। বিবাহ উৎসবেও পরিবর্তন দেখা যায়। সম্প্রতি চীনের বড়ো বড়ো শহরে 'ৎচি তুয়ান-চিত্র-হুয়েন' নামে একরকম দলগত বিবাহের প্রবর্তন হয়েছে। চীনদেশের বিয়ের ব্যাপারে একে বিপ্লব বলা যেতে পারে।

শবসৎকারও চীনের একটি বিশেষত্ব। চৈনিক শাস্ত্রমতে বিবাহ যেমন ছেলেমেয়েদের প্রতি একটা বিশেষ কর্তব্য, সৎকার তেমনি মাতাপিতার প্রতি বিশেষ কর্তব্য। সুতরাং পিতামাতার মৃত্যু হলে ছেলেদের অশৌচ পালন অপরিহার্য। একশত দিবস তারা ক্ষৌরকাজ করবে না, মদ্যপান করবে না, মাংস খাবে না, জীর্ণ শুভ্র বসন আর শোক-চিহ্ন স্বরূপ টুপি পরবে; ঈষৎ হ্যুব্জ হয়ে মৃত দেহের পাশে বসবে; এবং তাদের পাপের ফলেই যে পিতামাতার মৃত্যু হল এই মর্মে মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করবে। এই সংবাদ পেয়ে সমস্ত স্বজন পরিজন এসে মৃত আত্মার প্রতি উৎসর্গ নিবেদন করে এবং শোকসন্তপ্ত সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে।

চীনদেশে মৃতদেহকে কবর দেবার প্রথা। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই

মৃতের কোনো নিকটতম আত্মীয় দেহটিকে স্নান করিয়ে নূতন তৈরি সিল্কের পোশাক পরিয়ে দেয়; তারপর সুন্দর একটি শবাধারে করে মৃতকে প্রধান ঘরের মাঝখানে রাখা হয়। স্বজন পরিজন বন্ধুবান্ধব সব এসে শোক নিবেদন করে। মৃত্যুর তিনদিন পরে শবাধারটি বন্ধ করে মৃতের নাম আর জন্ম মৃত্যু তারিখ লেখা একটি কাষ্ঠফলক লাগিয়ে পূজা করা হয়। উনপঞ্চাশ দিন কেটে গেলে পর কবর দেবার জন্য একটি শুভ দিন স্থির করে খুব ঘটা করে ব্যাপারটি সম্পন্ন হয়। শবাধারটিকে জাঁকালো রকম করে সাজিয়ে আট থেকে চৌষট্টি জন লোক মিলে বয়ে নিয়ে যায়। পুত্র এবং প্রপৌত্রেরা সকলে লাঠিতে ভর করে শবাধারের আগে আগে যায়; অন্যান্য আত্মীয় বা বন্ধুবর্গ দুপাশে থাকে আর স্ত্রীলোকেরা গাড়িতে করে পেছনে পেছনে আসে। গানের দল আর পূজারীবৃন্দ, বৌদ্ধ ভিক্ষু আর তাও পুরোহিতবৃন্দ মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সামনে আর পেছনে শ্রেণীবদ্ধভাবে অনুগমন করে। শবযাত্রার জাঁকজমক যেন বিয়ের শোভাযাত্রার থেকেও বেশি হয়।

চীনের রীতিকর্মের ভিতর প্রধান হচ্ছে (১) ক্রীড়াপ্রদর্শনী এবং (২) ঋতুউৎসব। চীনা কৃষকেরা অবসর সময়ে রকমারি খেলাধুলা বা আমোদ প্রমোদের আয়োজন করে; যেমন 'তা-তুং' অথবা আলোক-ক্রীড়া, 'উ-শিহ' অথবা সিংহক্রীড়া, 'উ-লুং' অথবা ড্রাগনক্রীড়া, 'চাং-শি' অথবা নাটক। আলোকক্রীড়া একপ্রকার সাধারণের সমাবেশ; গ্রামের সকলে একত্র হয়ে প্রত্যেকে একটি করে দীপ হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। সিংহ বা ড্রাগন ক্রীড়া এক ধরনের ব্যায়াম বা যুদ্ধক্রীড়া; একজন সিংহের ছদ্মবেশে এবং দুজনে বানরের ছদ্মবেশে হাতে একটা করে রেশমি ঝোপ্পা নিয়ে খেলা করে;

সিংহটি যখনি কোনো বানরের থোপা কেড়ে নেয়, বানরটি দ্রুতবেগে পালাতে থাকে; তখন অন্যান্য সকলে নানারকম দৈহিক-কসরত দেখাতে শুরু করে, যেমন লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, দৌড়ঝাপ ইত্যাদি। ড্রাগন ক্রীড়াতে কাগজ, কাপড়, বাসপাতা ইত্যাদি দিয়ে অনেকগুলি বড়ো বড়ো ড্রাগন তৈরি করে আয়তন অনুযায়ী দশ, পঞ্চাশ বা একশ জনে মিলে নানারকম কসরত করতে করতে আর খেলা দেখাতে দেখাতে সেগুলিকে বয়ে নিয়ে যায়। আর নাটকগুলিতে সাধারণত ঐতিহাসিক আর বীরত্বব্যঞ্জক বই নির্বাচন করা হয়। গ্রামগুলিতে প্রতিবছর বা কয়েক বছর বাদে বাদে পাঁচ দশ দিন বা মাসখানেক ধরে এই ধরনের উৎসব চলে। এইসব উৎসবের সময়ে ঠিক ভারতবর্ষের মেলার মতো গ্রাম্য দ্রব্যাদির প্রদর্শনী বসে আর বেচাকেনা হয়।

ভারতীয়দের মতো চীনারাও খুব উৎসবপ্রিয়। উৎসবগুলির ভেতর নববর্ষ উৎসব বৃহত্তম। চৈনিক পঞ্জিকা অনুযায়ী বছরের প্রথম মাসের প্রথম পনেরো দিন ধরে উৎসব হয়। দেশের প্রতিটি গৃহ আলোক-মালায় সাজানো হয়, দরজা আর জানালায় লাল রঙের কাগজ দিয়ে তাতে শুভকামনা আর সৌভাগ্যসূচক রচনা, প্রবাদ ইত্যাদি লেখা হয়। সব রকমের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে গ্রামবাসী সকলে মিলে সম্মিলিত ভোজের আয়োজন করে। নববর্ষের পর পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে 'তুয়ান-উ' এবং অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিবসে 'চুং-চিন্' উৎসব। প্রথমটি হচ্ছে চীনের বিখ্যাত ড্রাগন-নৌ-প্রতিযোগিতা উৎসব, কখনো কখনো গ্রীষ্ম উৎসব নামেও পরিচিত। শেষোক্তটি হচ্ছে মধ্যশারদীয় চাঁদ উৎসব, অথবা শারদোৎসব। এর পরে নাম করা যায় তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিবসে 'চিং-মিন্' উৎসব এবং সপ্তম মাসের পঞ্চদশ দিবসে 'চুং-যুআন' উৎসব অনুষ্ঠান; প্রথমটি মৃত পূর্বপুরুষদের কবর পরিদর্শন

এবং দ্বিতীয়টি তাঁদের আত্মাকে স্মরণ করে ভোজোৎসব করবার দিন। সপ্তম মাসের সপ্তম দিনটি কুমারী মেয়েদের শুভদিন। নবম মাসের নবম দিনটি পণ্ডিত ও কবিদের চড়িভাতির দিন ; ঐদিন তাঁরা পাহাড়ে গিয়ে নানারকম আমোদ প্রমোদ করেন। সব রকমের উৎসবের কথা এখানে লিখতে গেলে গ্রন্থ বিরাট হয়ে উঠবে। চীনের উৎসবগুলির সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য যে-কোনো দেশের উৎসবের মতো এগুলি ধর্মোৎসব নয়, এর ভিত্তি মানবতা।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে রাজকার্যে দৈনিক পঞ্জিকার বদলে পাশ্চাত্ত্য প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে এবং নানাপ্রকার বৈপ্লবিক উৎসবের প্রচলন হয়েছে।[১] কিন্তু জনসাধারণ তাদের পুরানো তিথি গণনা এবং উৎসব আচার এখনও ছাড়েনি। এর কারণ শুধু এই নয় যে সংস্কার এড়ানো কঠিন, পাশ্চাত্ত্য প্রথার সাথে রুচির অসামঞ্জস্যও এর মূলে রয়েছে।

১. কয়েকটি নূতন উৎসব : (১) ১ জানুয়ারি চীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে চীন গণতন্ত্রের জাতীয় গভর্নমেণ্ট স্থাপিত হয় এবং ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন হন চীনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট। (২) ২৯ মার্চ—বিপ্লব দিবস, চীনে যাকে বলা হয় হল্‌দে-ফুল কবরের ছুটি। ১৯১১ সালের ২০ মার্চ তারিখে ক্যান্‌টনে বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয় আর তাতে ৭২ জন বীর যুবক নিহত হয়। ক্যানটন শহরের ধারে তাদের কবরস্থানকে বলে পীতপুষ্প সমাধি বা হল্‌দে-ফুল কবর ; চীনবাসীদের কাছে এখন সেটি তীর্থবিশেষ। (৩) ১০ অক্টোবর—একে বলে ডুই-দশমিক ছুটি (দশম মাসের দশম দিন) ; ১৯১১ সালের ১০ অক্টোবর তারিখে হুপে প্রদেশের রাজধানী উচাং শহরে আসল বিপ্লবের বা বিদ্রোহের শুরু, যার ফলে মাঞ্চুরাজের উচ্ছেদ এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। (৪) ১২ নভেম্বর— ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেনের জন্মদিন ; ১৮৬৬ সালের ১২ নভেম্বর তারিখে কোয়াং-টুং বিভাগের চুং-শান জিলায় তাঁর জন্ম হয়েছিল।

নব সংস্কৃতি আন্দোলন

চীনের সভ্যতা প্রাচীনতম, একথা আগেই বলা হয়েছে; চীনারা তাদের সংস্কৃতির জন্য গর্ববোধ করে এবং তার ছাপ বজায় রাখতে সর্বদাই চেষ্টা করে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই সে তার আশেপাশের দেশগুলির উপর কৃষ্টিগত প্রভুত্ব বজায় রেখে এসেছে; কেবল ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম যখন চীনে প্রভাব বিস্তার করে তখনি এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আমদানি হওয়ার সাথে সাথে এই ঐতিহ্যের ভিত্তি কেঁপে উঠল। দেশবাসীরা বিদেশীদের হালচাল ধরনধারন নকল করতে শুরু করল। চীনের এই সময়টাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা চলে।

প্রথম অহিফেন যুদ্ধ (১৮৪০-৪২) এবং ব্রিটিশ-ফরাসী সম্মিলিত দলের সাথে যুদ্ধ (১৮৫৭-৬০); এই যুদ্ধগুলিতে চীন পরাজিত এবং শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ফলে তার আত্মবোধ কিছুটা জাগ্রত হয়ে ওঠে। যুদ্ধের নবতন বৈজ্ঞানিক আয়োজন দেখে বিদেশীদের উপর চীনবাসীদের একটা শ্রদ্ধার ভাব আসে। আর এইসব পাশ্চাত্ত্য কৌশল আয়ত্ত করতে তারা উঠে পড়ে লেগে যায়, যার ফলে এক সময়ে চীনের নৌশক্তিকে ব্রিটেনের নৌশক্তির পরেই স্থান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৯৫ সালে চীন আবার জাপানের সাথে যুদ্ধে হেরে গেল। এর পরেই দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু।

এই যুদ্ধে হেরে গিয়ে চীনবাসীরা বুঝল যে খালি পশ্চিমের যুদ্ধোপকরণের অনুকরণই সব নয়; জাপান যে কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্য কৌশলই আয়ত্ত করেছে তা নয়, তারা পশ্চিম থেকে রাজনীতিক মতবাদও গ্রহণ করেছে। সুতরাং চীন দৃঢ়সংকল্প হল যে পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির মূল-

সূত্রগুলি নিজের করে নিতে হবে, প্রয়োজন হলে জাপান থেকেও তা গ্রহণ করতে হবে। এই সময়ে দুটি আন্দোলনের সূচনা হল, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন (constitutional) এবং রাষ্ট্রবিপ্লব ; যার ফলে মাঞ্চুরাজের উচ্ছেদ এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হল না, আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল এবং বৈদেশিক আক্রমণ সমানেই চলতে লাগল। এই অবস্থার ভিতর দিয়ে তৃতীয় পর্বের সূচনা।

গৃহবিবাদ এবং বৈদেশিক আক্রমণ যত বাড়তে লাগল, দেশবাসীরাও তত প্রচলিত ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস হারাতে লাগল। চীনকে যদি বাঁচতে হয় তবে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। যুগ যুগ ধরে ঘাতপ্রতিঘাতের পরে ইয়োরোপে যে ধারা প্রবর্তিত হয়েছে, চীনকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং চীনবাসীরা গভীর অধ্যবসায় নিয়ে আধুনিক ইয়োরোপীয় উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে লাগল। পশ্চিম থেকে যা কিছু চিরন্তন ও গ্রহণযোগ্য তাকে নিজের করে তুলবার এই সাধনাই হচ্ছে নবসংস্কৃতি আন্দোলনের ভূমিকা।

নবসংস্কৃতি আন্দোলনের সূত্রপাত পিকিং য়ুনিভার্সিটিতে, তার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ৎসাই-য়ুআন-পেই এর নেতৃত্বে। ডাঃ ৎসাই হচ্ছেন একজন আদর্শবাদী বৃদ্ধ পণ্ডিত, তিনি মাঞ্চুরাজত্বের সময়ে সর্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। তিনি অবশ্য নব্যপন্থী, উদার মতাবলম্বী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ; কেবলমাত্র তাঁরই নেতৃত্বে পুরাতন এবং নূতনে সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। বামপন্থীদের ভিতর ছিলেন চেন তু-শিউ আর ছিলেন হু শিহ, একজন মধ্যবর্তী সমন্বয়লিপ্সু ; পুরাতনপন্থীদের ভিতর ছিলেন লিম-সু। এঁরা সকলে একত্র হয়ে চীনের সাধারণ উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

চেন তু-শিউ অনেক প্রতিভাশালী যুবককে একত্র করেছেন। তিনি চীনের নূতন পত্রিকা 'নব যৌবন'-এর সম্পাদক। এতে চীনের পুরাতন সংস্কৃতিকে আক্রমণ করে বহু প্রবন্ধ বেরোয় যা গুণিসমাজকে বিস্মিত করে তোলে। এই পত্রিকার স্বপক্ষীয়েরা বলেন যে সকল অকল্যাণের এটি মহৌষধ, আর বিপক্ষীয়েরা বলেন যে এই পত্রিকা দেশের ভয়ানক ক্ষতি করবে। এতে প্রকাশিত কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধের নাম করা যেতে পারে, যেমন, (১) 'চৈনিক সাহিত্য বিপ্লব— চেন তু-শিউ এবং হু শিহ; (২) 'একটি আহ্বান' এবং 'জনৈক উন্মাদের দিন-লিপিকা'—লুশিন্, (চীনের প্রচলিত নৈতিক মতবাদের উপর প্রবলতম আক্রমণ); (৩) 'সংস্কার ও মনোবিজ্ঞান'— চেন তা-চি (চীনের পুরানো সংস্কারের বিশ্লেষণ এবং তার ত্রুটি প্রদর্শন)। এই পত্রিকা ছাড়া হুশিহ প্রণীত 'চিন বংশের পূর্ব প্রচলিত রাজনীতিক চিন্তাধারার ইতিহাস' নামক বইটির উল্লেখ করা যেতে পারে। লিয়াং সু-মিং তাঁর 'প্রাচ্য সংস্কৃতি ও দর্শন' বইটিতে পুরাতন আর নূতনের সমন্বয়ের চেষ্টা দেখিয়েছেন।

নবসংস্কৃতি আন্দোলনের দুরকম ফল দেখা গিয়েছে। একদিকে পুরানো সংস্কার আর রীতিনীতির হাস্যকরতা দূর করে নবতন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ; অপর দিকে চৈনিক ঐতিহ্যের উপর মর্মান্তিক আঘাত। ডাঃ ৎসাই পুরানো আর নূতনের সমন্বয়ে প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিলনে এক নূতন সংস্কৃতি তৈরি করতে চান। কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা ঠিক পথটি বুঝতে না পেরে এত বেশি এগিয়ে গেছেন যে অনেক সময়ে তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি এই আন্দোলনে এক নূতনতর পর্যায়ের সূচনা হয়েছে এবং একে ঠিক পথে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। এই নূতন প্রচেষ্টাই নবজীবন আন্দোলনের ভূমিকা।

নব জীবন আন্দোলন

মার্শাল চিয়াং কাইশেক নান-চাং এর কর্মক্ষেত্রে ১৯৩৪ সালের উনিশে ফেব্রুয়ারি নবজীবন আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। এই আন্দোলনের ভিতর দিয়েই চীনের ভবিষ্যৎ পথ নির্ধারিত হয়েছে; পূর্ববর্তী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা এই নবতন পথপ্রদর্শনে অনেক সহায়তা করেছে। এর আগে, বিশেষ করে গত দশবছর ধরে, চীন নানারকমের মত ও পথ নিয়ে একরকম পরীক্ষা চালাচ্ছিল; কিন্তু কোনোটাই আশানুরূপ ফল দেয়নি। রাজনৈতিক গগনে যে কুয়াশা জমে উঠেছিল তা আর অপসারণ করা যাচ্ছিল না। সামাজিক জীবনে এমন সব গণ্ডগোল দেখা যাচ্ছিল যে এই অবস্থার মীমাংসা না হলে চীনের যুগসঞ্চিত সংস্কৃতি ভূমিসাৎ হয়ে যাবার ভয় ছিল। ঠিক এই সময়ে নবজীবন আন্দোলনের সূত্রপাত হল, আর চীনের জাতীয় জীবনে কিছুটা উৎসাহ ও অগ্রগতি দেখা দিল।

এই আন্দোলনের মূলসূত্র হল চৈনিক দার্শনিক নীতিকে ভিত্তি করে প্রতীচীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সংযোগে জীবনকে নূতন করে গড়ে তোলা। হাজার হাজার বছর ধরে বহু ঋষি এবং জ্ঞানী মানব জীবনের সর্বৈব আলোচনা করে তাঁদের অভিজ্ঞতার ছাপ চিরন্তন করে রেখে গেছেন চীনদেশে। আবার অন্যদিকে অবহেলায় আর আবর্জনায় চীনাজাতি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ঠিক পথ হচ্ছে পুরানো যুক্তিবাদের প্রবর্তন এবং অধুনাতন বিশৃঙ্খলতার সংস্কার, এবং সঙ্গে সঙ্গে উদার মন নিয়ে বিদেশের থেকে যা কিছু ভালো তাকে নিজেদের অবস্থার উপযোগী করে গ্রহণ করা। এই ভাবে যৌক্তিকতার ভিত্তিতে চীনবাসীদের সুখী করা সম্ভব; এই নূতন প্রাণ সঞ্চারের ফলে জগতে চীনের স্থান গৌরবময় হবে, ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বলতর।

এই নব প্রাণ সঞ্চারের ছয়টি প্রণালী স্থিরীকৃত হয়েছে ; (১) পরিচ্ছেদের সমতা, (২) পরিচ্ছন্নতা, (৩) সরল জীবনযাত্রা, (৪) ব্যবহারে স্বাভাবিকতা, (৫) তৎপরতা ও কর্মঠতা এবং (৬) বাস্তবতা। এই ছয়রকম অভ্যাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনকে (১) নিয়ন্ত্রিত, (২) ফলপ্রসূ এবং (৩) শিল্পসংযত করে গড়ে তোলা। (১) নিয়ন্ত্রণ বা নিয়মানুবর্তিতার ফলে জাতি বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে, দেশকে ভালোবাসবে, ওজন বুঝে কাজ করতে শিখবে এবং সহজ ও সরলভাবে বাঁচতে শিখবে। (২) ফলপ্রসূ কার্য-প্রণালীর দ্বারা সকলেই জাতীয় সম্পত্তির বিস্তার করতে পারবে, সময় বাঁচিয়ে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়বে। (৩) শিল্পসংযত জীবন মানুষকে স্বাধীন, সহজ ও শান্তিপ্রিয় করে তুলবে। নিজেদের জীবন সম্পর্কে তারা সাবধান হবে, নির্মম হবে, তবু তাদের উদারতা আর গ্রহণশীলতা বজায় থাকবে। নিজেদের কাজ তারা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিখুঁতভাবে করবে। অপব্যয় থেকে তারা সংযত হবে ; জীবনকে পবিত্র এবং শুচি স্নিগ্ধ রাখবে।

এই হচ্ছে নূতন জীবন গড়বার স্থূল প্রণালী। কার্যকালে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনমতো নিয়মকানুন তৈরি করে নেয় ; যেমন নবজীবন আন্দোলনের কেন্দ্র নান-চাংএ সিনেমা থিয়েটার, চায়ের দোকান, হোটেল, রাস্তাঘাট পরিষ্কার ইত্যাদির জন্য আলাদাভাবে বিশদ নিয়ম ও নির্দেশাবলী ছিল। খাওয়া, কথা বলা প্রভৃতি সাধারণ ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে সামাজিক এবং জাতীয় বড়ো বড়ো সমস্যাকেও নিয়ন্ত্রণ করবার সাধনা এই আন্দোলনের। চীনদেশের খাদ্যদ্রব্যের প্রশংসা বহু বিদেশীয়দের কাছে শোনা যায় ; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তারা চীনের সভ্যতা ও দার্শনিকতা বা নৈতিকতার কোনো খবরই রাখে না। ঋষি মেনশিয়ুস্ বলেছেন, 'শুধু খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছাড়া

আর কোনো বিষয়ে যার নজর নেই সে কৃপার পাত্র'। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারটাও একটা অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, যার ইতরবিশেষে স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। যে বিদেশীয়রা চীনের খাদ্যতালিকা পছন্দ করেন তাদের জন্য বলা যেতে পারে, নবজীবন আন্দোলনে এই ব্যাপারে ষোলোটি নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে ; এই ষোলোটির ভিতর আছে— (৬) রান্না করবার আগে এবং গা চুলকানো ইত্যাদির পর রন্ধনকারীকে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে, (৭) পচা খাদ্যদ্রব্য ফেলে দিতে হবে, ক্রেতার কাছে তা হাজির করা চলবে না, (৯) রান্নাঘরের ভিতর খালি গায়ে অথবা খালি পায়ে থাকা চলবে না, (১০) খাবার জিনিসের সামনে হাঁচি দেওয়া চলবে না, (১১) মাথায় নরম হালকা রঙের টুপি, গায়ে লম্বা বহিরাবরণ (apron) আর হাতে সাদা দস্তানা থাকবে, এবং এগুলি সবসময়ে পরিষ্কার রাখতে হবে, (১২) গামছাগুলি সবসময়ে ধবধবে পরিষ্কার রাখতে হবে, আর রোজ সেগুলি ফুটন্ত জলে ধুয়ে নিতে হবে, (১৬) সব সময়ে আগুনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাবধান হতে হবে।

নবজীবন আন্দোলনের সূত্রপাত থেকেই তা সমগ্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশীরা আফিংখোর বলে চীনাদের দুর্নাম দিত। কিন্তু আসলে চীনে ধূমপায়ীদের সংখ্যা খুব অল্পই ছিল, এমন কি সিগারেট পর্যন্ত বন্ধ করে দেবার চেষ্টা হচ্ছিল। এদের সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ ছিল যে এরা জুয়া খেলে খুব বেশি। কিন্তু জুয়াড়ির সংখ্যাও কোনোকালে বেশি ছিল না, আর এখন এই ধরনের যে-কোনো ঝুঁকি (speculations) নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। এইভাবে আধুনিক চৈনিক সমাজ পুরানো কালের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠছে। বিগত কয়েক দশকে চীন ক্ষয়িষ্ণু ও দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল বলে বৈদেশিকরা তাকে ভুল বুঝে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার বিরুদ্ধে অনেক কিছু

প্রচার করেছে। চীনকে ঠিকমতো বুঝতে হলে নিরপেক্ষ মন ও বিচারশক্তি নিয়ে চীনের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও দর্শনের ভিতর প্রবেশ করতে হবে; তবেই সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ ধারণা দূর হবে। চীনের সাম্প্রতিক উন্নতির পথে যদি বিদেশী শক্তিবর্গ বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তবে কয়েক বছরের ভিতরেই এক নূতন চৈনিক সমাজ মাথা তুলে দাঁড়াবে, মানুষিকতার দাবিতে তারা সবরকম দায়িত্ব আর কর্তব্যকে আপন করে নেবে, একথা আমি জোর করেই বলতে পারি।

পরিশিষ্ট (ক)

চীনের রাজন্যবর্গের কালানুক্রমিক তালিকা

	শাসকবর্গের নাম	চৈনিক অব্দ	খ্রীস্টাব্দ
*১	প্যান কু (পৌরাণিক স্থাপয়িতা)	অনিশ্চিত	অনিশ্চিত
*২	সান হোয়াং (পৌরাণিক সম্রাটত্রয়)	„	„
*৩	শিহ চি (দশটি যুগ)	„	„
*৪	উ তি (পাঁচজন শাসক)	„	„
৫	হোয়াং তি (পীতসম্রাট)	১—১০০	খ্রীস্টপূর্ব ২৬৯৭—২৫৯৮
৬	হোয়াং-তির বংশধরগণ	১০০—৩৪১	„ ২৫৯৭—২৩৫৮
৭ ও ৮	তাং য়্যাও য়ু শুন্ স্বেচ্ছারাজ্যত্যাগের দুটি যুগ	৩৪১—৪৯২	„ ২৩৫৭—২২০৬
৯	শিয়া	৪৯৩—৯৩২	„ ২২০৫—১৭৬৬
১০	শাং	৯৩২—১৫৭৬	„ ১৭৬৬—১১২২
১১	চৌ (চউ)	১৫৭৬—২৪৫২	„ ১১২২— ২৪৬
১২	চিন	২৪৫২—২৪৯১	„ ২৪৬— ২০৭
১৩	হান্	২৪৯২—২৯১৬	„ ২০৬— খ্রীস্টপর ২১৯
১৪	সান্ কুয়ো (রাজ্যত্রয়)	২৯১৭—২৯৬১	খ্রীস্টপর ২২০— ২৬৪
১৫	লিয়াং-ৎসিন্ (ৎসিন্ রাজদ্বয়)	২৯৬২—৩১১৬	„ ২৬৫— ৪১৯
১৬	নান্ পো ৎসাও (দক্ষিণ ও উত্তরের রাজবংশ)	৩১১৭—৩২৭৮	„ ৪২০— ৫৮১
১৭	সুই	৩২৭৮—৩৩১৫	„ ৫৮১— ৬১৮
১৮	থাং	৩৩১৫—৩৬০৪	„ ৬১৮— ৯০৭
১৯	উ তাই (পাঁচটি রাজবংশ)	৩৬০৪—৩৬৫৭	„ ৯০৭— ৯৬০
২০	সুং	৩৬৫৭—৩৯৭৬	„ ৯৬০—১২৭৯
২১	য়ুআন (মঙ্গোল)	৩৯৭৬—৪০৬৪	„ ১২৭৯—১৩৬৭
২২	মিং	৪০৬৫—৪৩৪০	„ ১৩৬৮—১৬৪৩
২৩	চিং (মাঞ্চু)	৪৩৪১—৪৬০৮	„ ১৬৪৪—১৯১১
২৪	গণতন্ত্র	৪৬০৯—	„ ১৯১২—

পরিশিষ্ট (খ)

চীনজাতীয় গভর্নমেণ্টের গঠন ব্যবস্থা

জাতীয় গভর্নমেণ্ট ক. বিশেষ বিভাগ (১) জাতীয় সামরিক সংসদ, (২) জাতীয় অর্থ সংসদ, (৩) জাতীয় সংগঠন বিভাগ, (৪) চীন বিদ্যায়তন (Academia Sinica)।

খ. য়ুয়ান (Yuan) পঞ্চক :

(১) কার্যকারক য়ুআন— অভ্যন্তরীয় মন্ত্রীসভা, বৈদেশিক মন্ত্রীসভা, রাজস্ব বিভাগ, শিক্ষাবিভাগীয় মন্ত্রীসভা, সামরিক বিভাগ, নৌ বিভাগ, যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, কৃষি ও বন বিভাগ, অর্থনৈতিক মন্ত্রীসভা, সামাজিক মন্ত্রীসভা, মঙ্গোলীয় ও তিব্বতীয় বিভাগ, প্রবাসী চীনা বিভাগ, জাতীয় সহায়ক সমিতি, প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট, বিশেষ বিশেষ নাগরিক গভর্নমেণ্ট।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে আরো কয়েকটি নূতন বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন খাদ্য বিভাগ, সর্বজনীন যুদ্ধসহায়ক সভা, বিদেশী মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ সংসদ, সমরকালীন রাজধানীর বিমান আক্রমণ নিরোধ সমিতি, জাতীয় বৈমানিক সংসদ, গ্রন্থপ্রচার পরীক্ষক সভা, যুদ্ধকালীন চলচ্চিত্র পরীক্ষক সভা, ইত্যাদি। এর কয়েকটি বিভাগের কাজ যুদ্ধ-বিরতির পরেও চলছে।

(২) ব্যবস্থাপক য়ুআন—কয়েকটি সংসদ নিয়ে।

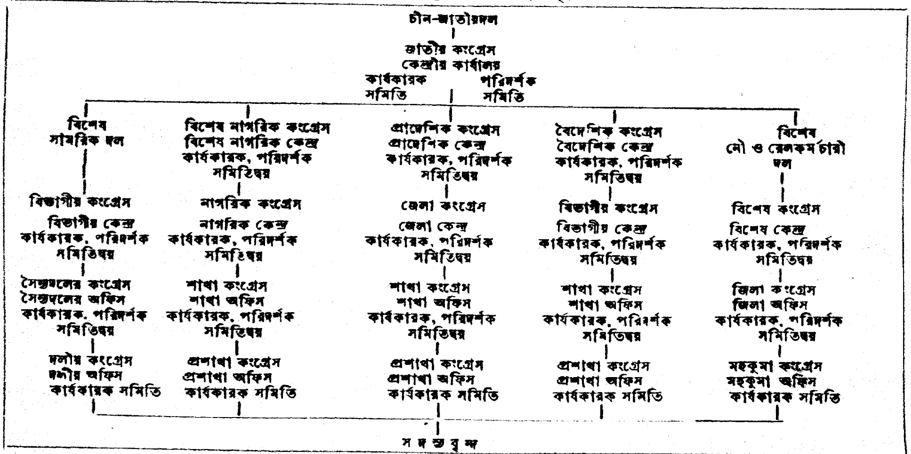
(৩) বিচার য়ুআন—নিম্ন ও উচ্চ আদালত।

(৪) পরীক্ষা য়ুআন—সভ্যসংসদ এবং পরীক্ষণ বিভাগ।

(৫) নিয়ন্ত্রণ য়ুআন—হিসাব পরীক্ষণ বিভাগ।

পরিশিষ্ট (গ)

চীন-জাতীয়দলের গঠনব্যবস্থা



॥ ১৩৫০ ॥

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

॥ ১৩৫১ ॥

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ